পত্রগুচ্ছ

সুকান্ত ভট্টাচার্য

পত্রগুচ্ছ

বেশ কাটছে এমনি। সবাই এমনি আপন হ'য়ে উঠেছে, সবাই ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে আমাকে। সত্যর-বোনী সবারই আনন্দ আমার সাথে রসিকতায় (এক এক সময় মনে হয় বেশ আছি - শহরের প্রকাণ্ড কোলাহলের বাইরে এই নির্ঝর, শ্যামল ছোট্ট একটু দ্বীপের মতো জায়গায় বেশ আছি) কিন্তু তবুও আমার শিকড় গাড়িয়ে উঠতে পারে নি। এখানে গাছের জন্যের রূপ-রস-গন্ধ-সমৃদ্ধ হয়নি সকাল সন্ধ্যায় মলক দিয়ে ওঠে উন্মাদের মতো। এমন আনন্দ বন্ধ দীঘির জলতে, যেমন থেকে লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে মাছের মতো কোটি কোটি মুক্তোর সুন্দরীর স্রোতে। সকালের আলোয়, অদ্ভুত বেদুর কোনো কোনো দিন সারাদিন ধ'রে কেবলই মন্ত্রণা দেয় বেরিয়ে পড়তে, সহর-বন্দর ছাড়িয়ে সবেক দূরের আমাগুলের সবুজ মুখ লুকোতে দেয় অবিশ্রান্ত। সত্যিই সময়ই লাগে কলকাতাকে ভুলতে এই সব ছুটিতে।

বেলেঘাটা
৩৪ হরমোহন ঘোষ লেন,
কলিকাতা।

শ্রীরুদ্রশরণম্—

পরমহাস্যাস্পদ, অরুণ,[১]—আমার ওপর তোমার রাগ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক, আর আমিও তোমার রাগকে সমর্থন করি। কারণ, আমার প্রতিবাদ করবার কোনো উপায় নেই, বিশেষত তোমার স্বপক্ষে আছে যখন বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ। কিন্তু চিঠি না-লেখার মতো বিশ্বাসঘাতকতা আমার দ্বারা সম্ভব হত না, যদি না আমি বাস করতাম এক বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে—তবুও আমি তোমাকে রাগ করতে অনুরোধ করছি। কারণ কলকাতার বাইরে একজন রাগ করবার লোক থাকাও এখন আমার পক্ষে একটা সান্ত্বনা, যদিও কলকাতার ওপর এই মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো কিছু ঘটে নি, তবুও কলকাতার নাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সব কটা লক্ষণই বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো আমি প্রত্যক্ষ করছি।···

···ম্লানায়মান কলকাতার ক্রমস্তম্ভমান[২] স্পন্দনধ্বনি শুধু বারম্বার আগমনী ঘোষণা করছে আর মাঝে-মাঝে আসন্ন শোকের ভয়ে ব্যথিত জননীর মতো সাইরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। নগরীর বুঝি অকল্যাণ হবে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে কলকাতা, তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক। এই হল কলকাতার বর্তমান অবস্থা। জানি না তোমার হাতে এ চিঠি পৌঁছবে কি না; জানি না ডাকবিভাগ ততদিন সচল থাকবে কি না। কিন্তু আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে, কখন কলকাতার অদূরে জাপানী বিমান দেখে আর্তনাদ করে উঠবে সাইরেন—সম্মুখে মৃত্যুকে দেখে, ধ্বংসকে দেখে। প্রতিটি মুহূর্ত এগিয়ে

চলেছে বিপুল সম্ভাবনার দিকে। এক-একটি দিন যেন মহাকালের এক-একটি পদক্ষেপ, আমার দিনগুলি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে বাসরঘরের নববধূর মতো এক নতুন পরিচয়ের সামীপ্যে। ১৯৪২ সাল কলকাতার নতুন সজ্জাগ্রহণের এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমার জন্ম-পরিচিত কলকাতা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর, অরুণ?

কলকাতাকে আমি ভালবেসেছিলাম, একটা রহস্যময় নারীর মতো, ভালবেসেছিলাম প্রিয়ার মতো, মায়ের মতো। তার গর্ভে জন্মানোর পর আমার জীবনে এতগুলি বছর কেটে গেছে তারই উষ্ণ-নিবিড় বুকের সান্নিধ্যে; তার স্পর্শে আমি জেগেছি, তার স্পর্শে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না, চিনি না, আমার পৃথিবী আমার কলকাতার মধ্যেই সম্পূর্ণ। একদিন হয়তো এ পৃথিবীতে থাকব না, কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি যে কলকাতায় বসে কলকাতাকে উপভোগ করছি। সত্যি অরুণ, বড় ভাল লেগেছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিহ্ন হব। "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদিন সে ষড়যন্ত্র করছে সভ্যতার সঙ্গে। তবু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে।

আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে। শুধু তখন থাকব না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবু তো জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম।···এই আমার আজকের সান্ত্বনা। তুমি চলে যাবার দিন আমার দেখা পাও নি কেন জান? শুধু আমার নির্লিপ্ত উদাসীনতার জন্যে। ভেবে দেখলাম কোনো লাভ নেই সেই দেখা করায়, তবু কেন মিছিমিছি মন খারাপ করব?···

কিন্তু সেদিন থেকে আর চিঠি লেখবার সুযোগ পাই নি। কারণ উপক্রমণিকা[৩] ভরিয়ে তুলল আমাকে তার তীব্র শারীরিকতায়—তার

বিদ্যুৎময় ক্ষণিক দেহ-ব্যঞ্জনায়, আমি যেন যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ালাম, স্তব্ধতায় স্পন্দিত হতে লাগলাম প্রতিদিন। দৃষ্টি দিয়ে পেতে চাইলাম তাকে নিবিড় নৈকট্যে। মনে হল আমি যেন সম্পূর্ণ হলাম তার গভীরতায়। তার দেহের প্রতিটি ইঙ্গিত কথা কয়ে উঠতে লাগল আমার প্রতীক্ষমান মনে। একি চঞ্চলতা আমার স্বাভাবিকতার? ওকে দেখবার তৃষ্ণায় আমি অস্থির হয়ে উঠতে লাগলাম বহুদর্শনেও। না-দেখার ভান করতাম ওকে দেখার সময়ে। অর্থাৎ এ ক'দিন আমার মনের শিশুত্বে দোলা লেগেছিল গভীরভাবে। অবিশ্যি একবার দুলিয়ে দিলে সে-দোলন থামে বেশ একটু দেরি করেই,—তাই আমার মনে এখনও চলছে সেই আন্দোলন। তবু কী যে হয়েছিল আমার, এখনও বুঝতে পারছি না; শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, আমার মনের অন্ধকারে ফুটে উঠেছিল একটি রৌদ্রময় ফুল। তার সৌরভ আজও আমায় চঞ্চল করে তুলছে থেকে থেকে। ওর চলে যাবার দিন দেখেছিলাম ওর চোখ, সে চোখে যেন লেখা ছিল "হে বন্ধু বিদায়, তোমাকে আমার সান্নিধ্য দিতে পারলাম না, ক্ষমা কর।" সে ক'দিন কেটেছিল যেন এক মূর্ছনার মধ্যে দিয়ে, সমস্ত চেতনা হারিয়ে গেছল কোনও অপরিচিত সুরলোকে। তোমরা একে পূর্বরাগ আখ্যা দিতে পার, কিন্তু আমি বলব এ আমার দুর্বলতা। তবে এ থেকে আমার অনুভূতির কিছু উন্নতি সাধন হল। কিন্তু এ ঘটনার পর আমি কোনও প্রেমের কবিতা লিখি নি, কারণ প্রেমে পড়ে কবিতা লেখা আমার কাছে ন্যক্কারজনক বলে মনে হয়।

আমার কথা তো অনেক বললাম, এবার তোমার খবর কি তাই বল। থিয়েটারের রিহার্সাল পুরোদমে চলছে তো?···তারপর··· সঙ্গে নিয়ত দেখা হচ্ছে নিশ্চয়ই? তার মনোভাব তোমার প্রতি প্রসন্ন, অন্যথায় প্রসন্ন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তোমার প্রেমের মৃদুশীতলধারায় তার নিত্যস্নানের ব্যবস্থা কর, আর তোমার সান্নিধ্যের উষ্ণতায় তাকে ভরিয়ে তুলো।

তুমি চলে যাবার পর আমি তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা', বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যর 'বনশ্রী', প্রবোধের 'কলরব', মণীন্দ্রলাল বসুর 'রক্তকমল' ইত্যাদি বইগুলি পড়লাম। প্রত্যেকখানিই লেগেছে খুব ভাল। আর অনাবশ্যক চিঠির কলেবর বৃদ্ধির কি দরকার? আশা করি তোমরা সকলে, তোমার মা-বাবা-ভাই-বোন ইত্যাদি সকলেই দেহে ও মনে সুস্থ। তুমি কি লিখলে-টিখলে? তোমার মা গল্প-সল্প কিছু লিখছেন তো? তাহলে আজকের মতো লেখনী কিন্তু চিঠির কাগজের কাছে বিদায় নিচ্ছে।

২৪শে পৌষ, ৪৮

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

□

দুই

বেলেঘাটা

কলকাতা

৩৪, হরমোহন ঘোষ লেন

—ফাগুনের একটি দিন।

অরুণ,

তোর অতি নিরীহ চিঠিখানা পেয়ে তোকে ক্ষমা করতেই হল, কিন্তু তোর অতিরিক্ত বিনয় আমাকে আনন্দ দিল এইজন্যে যে ক্ষমাটা তোর কাছ থেকে আমারই প্রাপ্য; কারণ তোর আগের 'ডাক-বাহিত' চিঠিটার জবাব আমারই আগে দেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, উল্টে আমাকেই দেখছি ক্ষমা করতে হল। তোর চিঠিটা কাল পেয়েছি, কিন্তু পড়লুম আজকে সকালে; কারণ পরে ব্যক্ত করছি। বাস্তবিক, তোর দুটো চিঠিই আমাকে প্রভূত আনন্দ দিল। কারণ চিঠির মতো চিঠি আমাকে কেউ লেখে না এবং এটুকু বলতে দ্বিধা করব না যে, তোর প্রথম চিঠিটাই আমার জীবনের প্রথম একখানি

ভাল চিঠি, যার মধ্যে আছে সাহিত্য-প্রধানতা। তোর প্রথম চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নি তোর মতোই অলসতায় এবং একটু নিশ্চিন্ত নির্ভরতাও ছিল তার মধ্যে। এবারে চিঠি লিখছি এইজন্যে যে, এতদিন ভয় পেয়ে পেয়ে এবার মরিয়া হয়ে উঠেছি মনে মনে।

কাল বিকেলে তোর বাবা ঠিকানা খুঁজে খুঁজে অবশেষে তোর চিঠিখানা আমার হাতে দিলেন এবং আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তোর মা-র কাছে। কিন্তু তুই বোধ হয় এ খবর পাস নি যে, তোদের আগের সেই লতাচ্ছাদিত, তৃণশ্যামল, সুন্দর বাড়িটি ত্যাগ করা হয়েছে। যেখানে তোরা ছিলি গত চার বছর নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায়, যেখানে কেটেছে তোদের কত বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা, কত বিরস দুপুর, কত উজ্জ্বল প্রভাত, কত চৈতালি হাওয়ায়-হাওয়ায় রোমাঞ্চিত রাত্রি, তোর কত উষ্ণ কল্পনায়, নিবিড় পদক্ষেপে বিজড়িত সেই বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হল আপাত নিষ্প্রয়োজনতায়। তোর মা এতে পেয়েছেন গভীরতম বেদনা, তাঁর ঠিক আপন জায়গাটিই যেন তিনি হারালেন। এক আকস্মিক বিপর্যয়ে যেন এক নিকটতম আত্মীয় সুদূর হয়ে উঠল প্রকৃতির প্রয়োজনে। শত শত জন-কোলাহল-মথিত ইস্কুল বাড়িটি আজ নিস্তব্ধ নিঝুম। সদ্য বিধবা নারীর মতো তার অবস্থা। তোদের অজস্র-স্মৃতি-চিহ্নিত তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গ যেন তোদেরই স্পর্শের জন্য উন্মুখ; সেখানে এখনও বাতাসে বাতাসে পাওয়া যায় তোদের স্মৃতির সৌরভ। কিন্তু সে আর কতদিন? তবু বাড়িটি যেন আজ তোদেরই ধ্যান করছে।

তোদের নতুন বাড়িটায় গেলুম। এ বাড়িটাও ভাল, তবে ও-বাড়ির তুলনায় নয়। সেখানে রাত প্রায় পৌনে এগারোটা পর্যন্ত তোর বাবা এবং মা-র সঙ্গে প্রচুর গল্প হল। তাঁদের গত জীবনের কিছু-কিছু শুনলাম; শুনলাম সুন্দরবনের কাহিনী। কালকের সন্ধ্যা কাটল একটি পবিত্র, সুন্দর কথালাপের মধ্যে দিয়ে, তারপর তোর বাবা-মা, তোর ছোট ভাই আর আমি গিয়েছিলাম তোদের সেই

পরিত্যক্ত বাড়িতে এবং এইজন্যেই ঐ সম্বন্ধে আমার এত কথা লেখা। দেখলাম স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে, সদ্যবিয়োগ-ব্যথাতুরা বিরহিণীর মতো বাড়িটার এক অপূর্ব মুহ্যমানতা। তারপর ফিরে এসে হল আরও কথা। কালকের কথাবার্তায় আমার তোর বাবা এবং মা-র ওপর আরও নিবিড়তম শ্রদ্ধার উদ্রেক হল। (কথাটা চাটুবাদ নয়)। তোদের (তোর এবং তোর মা-র) দুজনের লেখা গানটা পড়লুম; বেশ ভাল। কালকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম 'পাঁচটি ফাগুনসন্ধ্যা ও একটি কোকিল'[৪] গল্পটি। আজ দুপুরে সেটি পড়লুম। বাস্তবিক, এ রকম এবং এ ধরনের গল্প আমি খুব কম পড়েছি (ভালর দিক থেকে), কারণ ভাব এবং ভাষায় মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি। পাঁচটি ফাগুনসন্ধ্যার সঙ্গে একটি কোকিলের সম্পর্ক একটি নতুন ধরনের জিনিস। গল্পটা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য।

যাই হোক, এখন তোর খবর কি? তুই চলে আয় এখানে, কাল তোদের বাড়িতে তোর অভাব বড় বেশী বোধ হচ্ছিল, তাই চলে আয় আমাদের সান্নিধ্যে। অজিতের[৫] সঙ্গে পথে মাঝে মাঝে দেখা হয়, তোর কথা সে জিজ্ঞাসা করে। ভূপেন[৬] আজ এসেছিল—একটা চিঠি দিল তোকে দেবার জন্যে—আর একটু আগে তাকে এগিয়ে দিয়ে এলাম বাড়ির পথে। উপক্রমণিকার মোহ প্রায় মুছে আসছে। শ্যামবাজার প্রায়ই যাই। তুই আমাকে তোদের ওখানে যেতে লিখেছিস, আচ্ছা চেষ্টা করব।

চিঠিটা লিখেই তোর মা-র কাছে যাব। বাস্তবিক, তোর মা তোর জীবনে স্বর্গীয় সম্পদ। তোর জীবনে যা কিছু, তা যে তোর এই মা-কে অবলম্বন করেই এই গোপন কথাটা আজ জেনে ফেলেছি। তুই কিসের ঝগড়া পাঠালি, বুঝতে পারলুম না। তুই চলে আয়, আমি ব্যাকুল স্বরে ডাকছি, তুই চলে আয়। প্রীতি-ট্রিতি নেওয়ার ব্যাপার যখন আমাদের মধ্যে নেই, তখন বিদায়।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য।

বেলেঘাটা,
২২শে চৈত্র, ১৩৪৮।

সবুরে মেওয়াফল-দাতাসু,

অরুণ, তোর কাছ থেকে চিঠির প্রত্যাশা করা আমার উচিত হয় নি, সে জন্য ক্ষমা চাইছি। বিশেষত তোর যখন রয়েছে অজস্র অবসর—সেই সময়টা নিছক বাজে খরচ করতে বলা কি আমার উচিত? সুতরাং তোর কাছ থেকে চিঠি প্রাপ্তির দুরাশা আমায় বিচলিত করে নি।

কোনো একটি চিঠিতে আমার ব্যক্তিগত অনেক কিছু বলার থাকলেও আজ আমি শুধু আমার পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা দেব। প্রথমে দিচ্ছি কলকাতার বর্ণনা—কলকাতা এখন আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত, নাগরিকরা পলায়ন-তৎপর। নাগরিকরা যে পলায়ন-তৎপর তার প্রধান দৃষ্টান্ত তোমার মা, যদিও তিনি নাগরিক নন, নিতান্ত গ্রামের। তবু এ থেকে অনুমান করা যায় যে, কত দ্রুত সবাই করছে প্রস্থান আর শহরটি হচ্ছে নির্জন। তবে এই নির্জনতা হবে উপভোগ্য—কারণ এর জনাকীর্ণতায় আমরা অভ্যস্ত, সুতরাং এর নব্য পরিচয়ে আমরা একটা অচেনা কিছু দেখার সৌভাগ্যে সার্থক হব। আর কলকাতার ভীষণতার প্রয়োজন এই জন্যে যে, এত আগন্তুকের স্থান হয়েছিল এই কলকাতায়, তার ফলে কলকাতা কাদের তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন বিদেশী এলে সে বুঝতেই পারবে না, যতক্ষণ না তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে দেশটা কাদের। কারণ, যা ভীড়—তাতে মনে হয় দেশটা সকলের না-হোক, শহরটা সার্বজনীন।

আজকাল রাত একটায় যদি কলকাতা ভ্রমণ কর তাহলে তোমার ভয়ঙ্কর সাহস আছে বলতে হবে। শুধু চোর-গুণ্ডার নয়, কলকাতার

পথে এখন রীতিমত ভূতের ভয়ও করা যেতে পারে। সন্ধ্যার পর কলকাতায় দেখা যায় গ্রাম্য বিষণ্ণতা। এই আলোকময়ী নগরীকে আজকাল স্মরণ করা কঠিন; যেমন একজন বৃদ্ধা বিধবাকে দেখলে মনে করা কঠিন তার দাম্পত্য-জীবন। আর বিবাহের পূর্বে বিবাহোন্মুখ বধূর মতো কলকাতার দেখা দিয়েছে প্রতীক্ষা—অন্য দেশেরা বিবাহিতা সখীর মতো দেখবে ঘটিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

আজ আমার ভাইয়েরা চলে গেল মুর্শিদাবাদ—আমারও যাবার কথা ছিল, কিন্তু আমি গেলাম না মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার এক দুঃসাহসিক আগ্রহাতিশয্যে, এক ভীতি-সংকুল, রোমাঞ্চকর, পরম মুহূর্তের সন্ধানে। তবু আমার ক্লান্তি আসছে, ক্লান্তি আসছে এই অহেতুক বিলম্বে।

এ ক'দিন তোর মা-র সান্নিধ্য লাভ করলুম গভীরভাবে এবং আর যা লাভ করলুম তা এই চিঠিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। অনেক আলোচনায় অনেক কিছুই জানলাম যা জানার দরকার ছিল আমার। আর তোর বাবার সরল স্নেহে আমি মুগ্ধ। আমার খবর আর কী দেব? তবে উপক্রমণিকাকে আমি একেবারে মুছে ফেলেছি মন থেকে, তার জায়গায় যে আসন নিয়েছে তার পরিচয় দেব পরের চিঠিতে। ভূপেন বিরহ-বিধুর মন নিয়ে ভালই আছে এবং কলকাতাতেই আছে। তাকে অন্তত একখানা চিঠি দিস—এতদিন পরে। ঘেলু[1] এখানে নেই, কয়েক দিনের জন্যে ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি জায়গায় গেছে ভ্রমণোদ্দেশে, সুকুমার রায়ের বাড়ি। তোর খবর সমস্ত আমার জানা, সুতরাং কোনো প্রশ্ন করব না। আমার এই চিঠির উত্তর যতদিন পরে খুশি দিস—তবে না দিলেও ক্ষতি নেই। ইতি—

সুকান্ত ভট্টাচার্য

চার

বেলেঘাটা—চৈত্র সংক্রান্তি '৪৮
কলকাতা।

প্রভূতআনন্দদায়কেষু—

অরুণ, তোর আশাতীত, আকস্মিক চিঠিতে আমি প্রথমটায় বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম আর আরও পুলকিত হয়েছিলাম আর একটুকরো কাগজে কয়েক টুকরো কথা পেয়ে। তারপর কৃতসংকল্প হলাম পত্রপাঠ চিঠির জবাব দিতে। আজ খুব বেশী বাজে কথা লিখব না,—আর আমার চিঠি সাধারণত একটু উচ্ছ্বাসবর্জিতই, সুতরাং আজকে প্রধান কথাটি বলতে, সাধারণ জবাবগুলো একটু সংক্ষেপে সারব। এতে আপত্তি করলে চলবে না।

তুই যে খুব সুখে আছিস তা বুঝতে পারছি, আর তোর অপূর্ব দিনগুলির গন্ধ পেলাম তোর চিঠির মধ্যে দিয়ে। তুই আমাকে তোদের কাছে যেতে লিখেছিস, কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে কলকাতার ভয়ঙ্কর দিনগুলো হারিয়ে ফেলি। তবে আশা রইল, বৈশাখ মাসেই হয়তো লাভ করব তোর সামীপ্য। তবে তা দ্বিতীয় সপ্তাহে কিনা বলতে পারি না। আর তোদের ওখানে যাবার একটা 'নীট-খরচ' যদি জানিয়ে দিতে পারিস, তবে আমার কিছু সুবিধা হয়। তোর একাকীত্ব ভাল লাগে না এবং ভাল লাগে না আমারো এই প্রাণস্পর্শহীন আত্মমগ্নতা। তবে একাকীত্ব অনুকূল নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করার পক্ষে। একাকী মানুষ যা চিন্তা করে সেইটাই তার নিজের চিন্তা। নিঃসঙ্গ মানুষ নিজের প্রকৃতিকে পায়। সেই জন্যেই, একাকীত্বের একটা উপকারিতা আছে বলে আমার মনে হয়। তা দীর্ঘ হলেও ক্ষতি নেই।

তোর কথামত অজিতকে শুধু জানিয়েছি তোকে লেখার কথা। আর কাজগুলো সবই ধীরে সুস্থে সম্পন্ন করব—সন্দেহ নেই।···তোর

চিঠি পড়তে-পড়তে একটা জায়গায় থমকে গিয়েছিলাম আমার চিঠির প্রশংসা দেখে, কারণ তোর কাছে আমার চিঠির মূল্য হয়তো কিছুটা থাকতে পারে, কিন্তু অন্যের কাছে প্রশংসনীয় জেনে নিজের সম্বন্ধে আমার বিস্ময় বেড়ে গেল, বিশেষত আমার মতো জলীয়, লঘুপাক চিঠিগুলো যদি প্রশংসা পেতে থাকে, তবে চিঠির ভালত্ব বিচার করা কঠিন হয়ে পড়বে মনে হচ্ছে। আমার সমগ্র জীবনের লেখা তোদের ওখানে নিয়ে যাওয়া অসাধ্য-সাধন সাপেক্ষ। কারণ লেখা আমি সঞ্চয় করি না কখনও, যেহেতু লেখবার জন্য আমিই যখন যথেষ্ট, তখন আমার সঙ্গে একটা অহেতুক বোঝা থাকা রীতিমত অন্যায়। তবে প্রকৃতির প্রয়োজন বাঁচিয়ে যেগুলো এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত, সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি।

তুই আমাকে গ্রহ-বিচ্ছিন্ন উল্কার সঙ্গে তুলনা করেছিস—কিন্তু গ্রহটা কু-গ্রহ, যেহেতু তার আগ্রহ আমায় নিক্ষেপ করা কোনো এক প্রশংসা-মুখর ক্ষেত্রে। যাই হোক, তোর এই চিঠিটা যেন নতুন জন্মের আভাস দিয়ে গেল। এখন শোন, যে "আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছে দান" তার পরিচয় :—এই পরিচয়পত্রের প্রারম্ভেই তোর কাছে ক্ষমা চাইছি, তোর কাছে একদিন ছলনার প্রয়োজন হয়েছিল বলে। কিন্তু আর নয়, এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আর কপটতার আশ্রয় নিলুম না এই জন্যই যে, কথাটা গোপন হলেও ব্যথাটা আর গোপন থাকতে চায় না, তোর কাছে—উলঙ্গ, উন্মুক্ত হয়ে পড়তে চায়। এ-ব্যাপারটা আমার প্রাণের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ যে, তোর কাছেও তা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আবেগের বেগে সংযমের কঠিনতা গলে তা পানীয়রূপে প্রস্তুত হল তোর কৌতূহলে। তুই এ-প্রেমে ফেনায়িত কাহিনী-সুরা কি পান করবি না ?—এই সুরার মূল্য যে শুধু সহানুভূতি ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস।

…কে তুই চিনিস,—যদি 'না চিনি না' বলিস তবে তাকে চিনিয়ে

দিচ্ছি, সে উপক্রমণিকার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সর্বোপরি সে আমার আবাল্যের সঙ্গিনী, সঙ্গিনী ঠিক নয়, বান্ধবী। যখন আমরা পরস্পরের সমুখে উলঙ্গ হতে দ্বিধা বোধ করতুম না, সেই সুদূর শৈশব হতে সে আমার সাথী। সব কিছু মনে পড়ে না, তবু এইটুকু মনে পড়ে যে, আমরা একত্র হলে আনন্দ পেতুম এবং সে আনন্দ ছিল নানারকমের কথা বলায়। একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, আমাদের উভয়ের দেখা হত, কোনো কারণে, প্রায়ই। সে আমায় শ্রদ্ধা করত এবং আমার সান্নিধ্যে খুশি হত। একবার আমাদের উভয়কেই···যেতে হয়, সেখানেই আমরা আরো অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ি এবং আমি সেখান থেকেই লাভ করি ওর সান্নিধ্যের আকর্ষণ। তখন আমার বয়স ১১, তার ৯। তারপর আমাদের দেখা হতে লাগল দীর্ঘদিন পরে পরে।···

সেখানে আমি ঘনঘন যেতে লাগলুম।···ওর আকর্ষণে অবিশ্যি নয়। বাস্তবিক আমাদের সম্পর্ক তখনও অন্য ধরনের ছিল, সম্পূর্ণ অকলঙ্ক, ভাই-বোনের মতোই।

তখন ওকে নিয়ে যেতাম পার্কে বেড়াতে, উপক্রমণিকার বাড়ি ওকে পৌঁছে দিতাম দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। একত্রে আহার করতাম, পাশাপাশি শুয়ে বই পড়ে শোনাতাম ওকে, রাত্রেও পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোতাম। ঘুমের মধ্যে ওর হাতখানি আমার গায়ে এসে পড়ত, কিন্তু শিউরে উঠতাম না, ওর নিঃশ্বাস অনুভব করতাম বুকের কাছে। তখনো ভালবাসা কি জানতাম না আর ওকে যে ভালবাসা যায় অন্যভাবে, এ তো কল্পনাতীত। কোনো আবেগ ছিল না, ছিল না অনুভূতির লেশমাত্র।

শেষে একদিন, যখন সবে এসে দাঁড়িয়েছি যৌবনের সিংহদ্বারে, এমনি একদিন, দিনটার তারিখ জানি না, পাশাপাশি শুয়েছিলাম, ঘুমিয়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি ভোর হচ্ছে আর সেই ভোরের আলোয় দেখলাম পার্শ্ববর্তিনীর মুখ। সেই নব প্রভাতের

পাণ্ডুর আলোয় মুখখানি অনির্বচনীয়, অপূর্ব সুন্দর মনে হল। কেঁপে উঠল বুক, যৌবনের পদধ্বনিতে। হঠাৎ দেখি ও চাইল আমার দিকে চোখ মেলে, তারপর পাশ ফিরে শুল। আর আমি যেন চোরের মতো অপরাধী হয়ে পড়লাম ওর কাছে। লজ্জায় সেই থেকে আর কথা বলতে পারলাম না—আজ পর্যন্ত।···জিজ্ঞাসা করল, সুকান্ত কথা বলছে না কেন আমার সঙ্গে? ···বহুবার চেষ্টা করল আমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে—কিন্তু আমারই বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল ওর ওপর, কেন জানি না। (আমার বয়স তখন ছিল ১৩।১৪)। এই বিতৃষ্ণা ছিল বহুদিন পর্যন্ত। আমিও কথা বলি নি।

তারপর গত দু বছর আস্তে আস্তে যা গড়ে উঠেছে, সে ওর প্রতি আমার প্রেম। নতুন করে ভালবাসতে সুরু করলাম ওকে। বহুদিন থেকেই উপক্রমণিকাকে নিয়ে···রা আমাকে ঠাট্টা করত। আমার কাছে হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করল, উপক্রমণিকাকে তোর সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। আমি আপত্তি করলেও খুব বেশী আপত্তি করলাম না এই জন্যে যে, ভেবে দেখলাম, আমার এই নব যৌবনে ভাল একজনকে যখন বাসতেই হবে তখন ···র চেয়ে বৈধ উপক্রমণিকাকে হৃদয়দান, সুতরাং সম্মত হওয়াই উচিত। কেন জানি না, ···নিজে আমাদের মিলন সংঘটনের দায়িত্ব নিল। উপক্রমণিকাও একবার আমার সঙ্গে আলাপ করতে রাজী হয়েও রাজী হল না। আমিও দু'তিন বার ওর প্রেমে পড়ে শেষে মোহমুক্ত হলাম তুই চলে যাবার পর। অর্থাৎ সম্প্রতি কয়েক মাস। এখন···কেই সম্পূর্ণ ভালবাসছি। ···কে যে ভালবাসা যায় তা জানলাম, ···প্রতি আমার এক নির্দোষ চিঠি এক বৌদির কাছে সন্দেহিত হওয়ায়। চিঠিটায় উচ্ছ্বাস ছিল সন্দেহ নেই, তাতে ছিল ওর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। কিন্তু তাতে সন্দেহ করা যায় দেখে বুঝলুম আমি ওকে ভালবাসতে পারি। যদিও আমার বোন ছিল না বলে ওর ভাইফোঁটা নিয়েছি দু'বার, আমাদের কথা বন্ধ হওয়ার পরও। আমি ওকে এখন ভালবাসি

পরিপূর্ণ ও গভীরভাবে। ওর কথা আরও লিখব পরের চিঠিতে। আজ এই পর্যন্ত। এখন অন্যান্য খবর দিচ্ছি, শৈলেন[৮] ও মিণ্টু[৯] দুজনেই কলকাতা ছেড়েছে বহুদিন। আর বারীনদার[১০] B. A. Examination ১লা মার্চ। সুতরাং তিনি ব্যস্ত আছেন পড়াশুনায়। ইতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য

পুনশ্চ :—উপক্রমণিকার পরিবর্তে যে দেবীর শুভপ্রতিষ্ঠার কথা লিখেছিস, তিনি দেবী হতে পারেন, কিন্তু সৌভাগ্যবতী আখ্যা দিয়েছিস তাঁকে কি জন্যে? আমি যে তাঁর উপযুক্ত নই।

সু. ভ.

এই চিঠির উত্তর সত্বর দিবি, আমিও তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দেব। আজ তোদের ওখানে নববর্ষ—সুতরাং তার প্রীতি গ্রহণ কর।

□

পাঁচ

বেলেঘাটা

১৭।৪।৪২

আশানুরূপেষু,

অরুণ, আজ আবার চিঠি লিখতে ইচ্ছে হল তোকে। আজকের চিঠিতে আমার কথাই অবিশ্যি প্রধান অংশ গ্রহণ করবে। এ জন্যে ক্ষুব্ধ হবি না তো? কারণ আজকে আমি তোকে জানাব আমার সমস্যার কথা, আমার বিপ্লবী অন্তর্জগতের কথা। এই চিঠির আরম্ভ এবং শেষ…র কথাতেই পরিপূর্ণ থাকবে। একবার যখন আদি-অন্ত জানতে কৌতূহল প্রকাশ করেছিস, তখন তোর এ-চিঠি ধৈর্য ধরে পড়তেই হবে এবং আমার জন্যে মতামত আর উপদেশ পাঠাতে হবে।

আজকে এইমাত্র…র কথা ভাবছিলুম, ভাবতে-ভাবতে ভাবলুম তোকেই ডাকা যাক পরামর্শ এবং সমস্যা-সমাধানের জন্যে। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করব, আমার এই প্রেমের ওপর আস্থা ও সহানুভূতি তোর মনের কোণে বাসা বেঁধেছে কি? যদি না-বেঁধে

থাকে, তবে এই চিঠি পড়া এখানেই বন্ধ করতে পারিস। যদিও তুই একবার আমাকে কৌতূহল জানিয়ে আমার মনের চোরা-কুঠুরীর দ্বার ইতিমধ্যেই ভেঙে দিয়েছিস, তবুও তোকে জিজ্ঞাসা করছি, আমার এই সমস্যার ওপর তোর কিছুমাত্র দরদ জেগেছে কি না। যদি জেগে থাকে তবে শোন :

আমার প্রধান সমস্যা, আমি আজও জানি না ও আমায় ভালবাসে কি না। কতদিন আমি ভেবেছি, ওর কাছে গিয়ে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করব, এই কথার উত্তর চাইব ; কিন্তু সাহস হয় নি। একদিন এগিয়েও ছিলাম, কিন্তু ওর শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে আমার কথা বলবার শক্তি হারিয়ে গেছল, অসাড়তা লাভ করেছিল চেতনা।

ভাল ও আমায় বাসে কি না জানি না, তবে সমীহ করে, এটা ভালরকম জানি।

আবার সন্দেহ হয়, হয়তো ও আমায় ভালবাসে এবং আমি যে ওকে ভালবাসি এটা ও জানে। কিন্তু যুক্তি দিয়ে অনুভব করি ওর প্রেমহীনতা।

বাস্তবিক আমার প্রেমের বেদনা বড় অভিনব। হয়তো আমি যে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি দেখি সেই সিঁড়ি দিয়েই ও নামছে, অবতরণকালীন ওর ক্ষণিক দৃষ্টি আমার চোখের ওপর পড়ে আমার বুকে স্নিগ্ধমধুর শিহরণ জাগিয়ে যায়। একটু আনন্দ, কিন্তু পরক্ষণেই বেদনায় মুষড়ে পড়ি। একটি ঘরে অনেক লোক, তার মধ্যে আমি যখন কথা বলি, তখন যদি দেখি ও আমার মুখের দিকে চেয়ে আমারই কথা শুনছে, তাহলে আমার কথা বলার চাতুর্য বাড়ে আরও বেশি, আমি আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ি, এমনি ওর প্রতি আমায় প্রেম। কিন্তু বড় ব্যথা।

বছর খানেক আগে আমার ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ঘটেছিল এবং আমিও সে সুযোগ অপব্যয়িত করি নি। অবিশ্যি ইতিপূর্বেই···র

চেষ্টায় অস্বাভাবিকভাবে কথা বলার চেষ্টা আমাদের করতে হয়েছিল। ঘটনাটা তোকে একবার বলেছি, তবু বলছি আর একবার: একটা সভা-মতো করা হল, তাতে উপস্থিত থাকল···। সেই সভায় আমাদের কথা বলতে হল। প্রথমে সে তো লজ্জায় কথা বলতেই চায় না, শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করল, সিগারেট খাওয়ার অপকারিতা কী? আমি এতক্ষণ উদাস হয়ে (অর্থাৎ ভান করে) ওদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলুম, এইবার অতিকষ্টে জবাব দিতে থাকলুম। কিন্তু সেদিন আর আলাপ এগোয় নি।

এদিকে আমি উপলব্ধি করলুম ওর সঙ্গে কথা বলার অমৃতময়তা। তারপর থেকে ওর সঙ্গে আমার কথা বলার তৃষ্ণা অসীম হয়ে দেখা দিল এবং সে তৃষ্ণা আজও দূরীভূত হয় নি।

এর মাস খানেক পরে এল আর এক সুযোগ। আমাদের বেলেঘাটায় এল ও, কোনো কারণে। সারাদিন ও রইল কিন্তু কোনো কথা বললাম না ওর সঙ্গে। কিন্তু সন্ধ্যার পর এমন এক সময় এল যখন আমরা দুজনেই একটি ঘরে একা পড়ে গেলাম। দুইজনেই শুনছিলাম রেডিও। রেডিওতে গান হচ্ছিল, "প্রিয় আজো নয়, আজো নয়।" কিন্তু গানটাকে আমি লক্ষ্য করি নি এবং লক্ষ্য করার মতো মনের অবস্থাও তখন আমার ছিল না। কারণ কাছে, অতি কাছে ও বসেছিল, বোধহয় অন্যদিকে চেয়ে নিবিষ্ট মনে গানই শুনছিল, আর আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম ওকে, অত্যন্ত সুন্দর পোশাক-সজ্জিতা ওকে আমার বড় ভাল লাগল। ভেবে দেখলাম এক ঘরে থেকেও দুজনে কথা না বলা লোকচক্ষে নিতান্ত অশোভন। তাই অনেকক্ষণ ধরে মনে বল সঞ্চয় করে ডাকলুম—"..."। কিন্তু গলা দিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ কম্পিত স্বর বেরুল, ও তা শুনতে পেল না। এবার বেশ জোর দিয়েই ডাকলুম, ও তা শুনতে পেল। চমকে উঠে আমার দিকে চাইল। এবং আমিও এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত মুখস্থ করা কথাটা কোনো রকমে বলে

ফেললাম, "ইচ্ছে হলে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পার।"

ও মাথা নীচু করলে, কিছুই বললে না। মনে হল ও যেন রীতিমত ঘামছে। সেদিন আমার জীবনের শুভদিন ছিল, প্রাণভরে সেদিন ওর কথা পান করেছিলাম। তারও মাস খানেক পরে এসেছিল শেষ শুভদিন—সেদিন আমাদের কলকাতার প্রায় মাইল খানেক পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। মোটরে করে আমরা উপক্রমণিকার বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর ইচ্ছা ছিল, আমার সঙ্গে ও সেদিন উপক্রমণিকার আলাপ করিয়ে দেবে। সৌভাগ্যবশত মোটরটা আমাদের সেখানে নামিয়েই ফিরে যায়। আর আমরাও ফিরতি পথে দুজনের সঙ্গ অনুভব করলুম। সেদিন নেশা লেগে গিয়েছিল ওর সঙ্গে চলতে, কথা বলতে। মনে করে দেখ, কলকাতার রাজপথে একজন সুন্দরী-সুবেশা মেয়ের পাশে-পাশে চলা কি কম সৌভাগ্যের কথা! ওর পাশে চলে, ওর এত কাছে থেকে, যে আনন্দ সেদিন আমি পেয়েছি, তা আমার বাকী জীবনের পাথেয় হয়ে থাকল। ও এখন বিমান আক্রমণের ভয়ে চলে গেছে সুদূর ··তে। আর আমি তাই বিরহ-বিধুর হয়ে তোকে চিঠি লিখছি আর ভাবছি রবীন্দ্রনাথের দুটো লাইন,—

"কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া
দূরে যবে গেল তারি লাগিল হাওয়া।"

আমার দ্বিতীয় সমস্যা আরও ভয়ঙ্কর। যদি আমার আত্মীয়রা জানতে পারে একথা, তবে আমার লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না। বিশেষত, আমার বিশ্বাসঘাতকতায়···নিশ্চয়ই আমার সংস্পর্শ ত্যাগ করবে। অতএব এখন আমার কি করা কর্তব্য চিঠি পাওয়া মাত্র জানাস।

ইতি—
সুকান্ত ভট্টাচার্য

পুনশ্চ—মা-কে বলিস এবার আর তাঁকে লিখলাম না বটে, কিন্তু শীগ্‌গিরই একখানা বৃহৎ লিপি তাঁর সমুখে উপনীত হবে। আর তিনি নিশ্চয়ই তার বপু দেখে চমকে যাবেন।

ছয়

সৎসঙ্গশরণম্

শ্রীশ্রীশ্রী ১০৮ অর্ণব-স্বামী[১১] গুরুজীমহারাজ সমীপেষু,

শতশত সেলামপূর্বক নিবেদন,

পরমারাধ্য বাবাজী, আপনার আকস্মিক অধঃপতনে আমি বড়ই মর্মাহত হইলাম। ইতোমধ্যে শ্রবণ করিয়াছিলাম আপনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, তখন মানসপটে এই চিন্তাই সমুপস্থিত হইয়াছিল যে ইহা সাময়িক মত্ততা মাত্র; কিন্তু অধুনা উপলব্ধি করিতেছি আমার ভ্রম হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ইহাই অনুমিত হইতেছে যে কাহারও সুমন্ত্রণায় আপনি এই পথবর্তী হইয়াছেন। অতএব আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃদ্ধ পিতা এবং অসুস্থা মাতার প্রতি ঐহিক কর্তব্যসকল পদাঘাতে দূরীভূত করিয়া কোন নীতিশাস্ত্রানুযায়ী পারলৌকিক চরমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত আপনি এক মোহমার্গ সাধনা করিতেছেন? এক্ষেত্রে আমার নিবেদন এই যে, অচিরে এই সৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক আপনার এই অস্বাভাবিকতা বর্জন করিয়া স্বীয় কর্তব্যকরণে প্রবৃত্ত হউন। আপনার পিতাঠাকুরের নির্দেশমত আপনার কলিকাতায় আসিয়া থাকাই আমার অভিপ্রায়। এ স্থানেও সৎসঙ্গের অনটন হইবে না, উপরন্তু আমার মতো অসতের সহিত দুই-চারিটা কথোপকথনের সুবিধাও মিলিবে, অবশ্য ইহা আমারই সৌভাগ্যজনক হইবে। যদিচ এ আশা নিতান্তই অকল্পেয়, তথাপি চিন্তা করিতে দোষ কি? আমার দুইখানি পত্রে যে সকল আবেগময় গোপন কথা লিখিয়াছিলাম, তাহার উত্তরের আশা বিসর্জন দিয়াছি; কিন্তু এ পত্রের বিস্তৃত উত্তর না পাইলে ইহাই আমার শেষ চিঠি জানিবেন।

ইতি—

দাসানুদাস,

সেবক—শ্রীসুকান্ত।

□

সাত

অরুণ,

প্রথমে বিজয়ার সম্ভাষণ জানিয়ে রাখছি। এরপর একে একে প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। প্রথমে কথা হচ্ছে জীবু 'কবিতা' শেষ পর্যন্ত দিল না—চেয়েছিলাম, তা সত্ত্বেও। তবে আগের ক'খানা রেখে দিয়েছি, সামনের সপ্তাহ থেকে সেগুলি ক্রমান্বয়ে পাঠাবার সঙ্কল্প রইল। আর পেনুর ওখানে গেলাম না নিজের নিতান্ত অনিচ্ছায়, বইখানা ওর অজ্ঞাতসারে ওকে দান করলুম, তুই বরঞ্চ ওকে আর একখানা চিঠি ডাক মারফৎ পাঠাস। সুভাষের কাছে যাই-যাই করে যাওয়া হয় নি, তবে যাবার ইচ্ছা আছে। এখানে সপ্তমীর দিন সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর রাত্রে ভয়াবহ ঝড় সমস্ত কলকাতায় অল্পবিস্তর ক্ষতচিহ্ন রেখে গিয়েছিল। কাল শ্যামবাজারে গিয়ে প্রভূত আনন্দ পেলুম ওদের উচ্ছল সাহচর্যে—শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর সঙ্গে কোলাকুলি কালকের দিনের স্মরণীয় ঘটনা। আজ দুপুরে আমাদের উপন্যাসখানা[১২] শ্যামবাজারে নিয়ে গিয়েছিলুম—তোর অংশটুকুর ওরা খুব প্রশংসা করল, আমি এখনো হাত দিই নি, এর পরের পরিচ্ছেদ লিখছে ঘেলু। তোর ঘরটায় আজকাল আমাদের অফিস বসেছে। আচ্ছা তোর সেই মেয়েটিকে মনে আছে, আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীলা? সহসা শ্যামবাজারে তাঁর সঙ্গে দেখা, আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের একটি বই ছিল, সেটি দিয়ে লাভ করলুম মোমবাতির আলোর মতো তাঁর স্নিগ্ধ ব্যবহার। তোর শরীর ভাল আছে জেনে নিশ্চিন্ত হলুম, ফিরছিস কবে? ভাইবোনেরা ভাল আছে? বাবা-মাকে আমার বিজয়ার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাস—তাঁরা বোধ করি ভাল আছেন? আমার বই বেরোচ্ছে, তবে নতেদা-রা[১৩] দার্জিলিং থেকে না-এলে নয়।

—সুকান্ত। রাত ১০-১০

২০শে অক্টোবর ১৯৪২

আট ৮।১১।৪২

অরুণ,

তোর খবর শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি। আমার পুরো একখানা চিঠি পরে পাঠাচ্ছি। যথাসত্বর তোদের সার্বজনীন কুশল প্রার্থনা করি।[১৪]

—সু

□

নয় ২০, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড
২৮শে ডিসেম্বর : ১৯৪২
—বেলেঘাটা—
সোমবার, বেলা ২টো।

অরুণ!

দৈবক্রমে এখনও বেঁচে আছি, তাই এতদিনকার নৈঃশব্দ্য ঘুচিয়ে একটা চিঠি পাঠাচ্ছি—অপ্রত্যাশিত বোমার মতোই তোর অভিমানের 'সুরক্ষিত' দুর্গ চূর্ণ করতে। বেঁচে থাকাটা সাধারণ দৃষ্টিতে অনৈসর্গিক নয়, তবুও তা দৈবক্রমে কেন, সে রহস্য ভেদ করে কৃতিত্ব দেখাব তার উপায় নেই, যেহেতু সংবাদপত্র বহু পূর্বেই সে কাজটি সেরে রেখেছে। যাক, এ সম্বন্ধে নতুন করে বিলাপ করব না, যেহেতু গত বছরে এমনি সময়কার একখানা চিঠিতে আমার ভীরুতা যথেষ্ট ছিল, ইচ্ছা হলে পুরনো চিঠির তাড়া খুঁজে দেখতে পারিস। এখন আর ভীরুতা নয়, দৃঢ়তা। তখন ভয়ের কুশলী বর্ণনা দিয়েছি, কারণ সে সময়ে বিপদের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু বিপদ ছিল না। তাই বর্ণনার বিলাস আর ভাষার আড়ম্বর প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল, এখন তো বর্ষমান বিপদ। কাল রাত্রিতেও আক্রমণ হয়ে গেল, ব্যাপারটা ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে, আর এটা একরকম ভরসারই কথা। গুজবের আধিপত্যও আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। তোরা এখানকার সঠিক সংবাদ পেয়েছিস কিনা জানি

না। তাই আক্রমণের একটা ছোটখাটো আভাস দিচ্ছি। প্রথম দিন খিদিরপুরে, দ্বিতীয় দিনও খিদিরপুরে, তৃতীয় দিন হাতীবাগান ইত্যাদি বহু অঞ্চলে—(এই দিনকার আক্রমণ সবচেয়ে ক্ষতি করে), চতুর্থ দিন ড্যালহৌসি অঞ্চলে—(এইদিন তিন ঘণ্টা আক্রমণ চলে আর নাগরিকদের সবচেয়ে ভীতি উৎপাদন করে, পরদিন কলকাতা প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়) আর পঞ্চম দিনে অর্থাৎ গতকালও আক্রমণ হয়। কালকের আক্রান্ত স্থান আমার এখনও অজ্ঞাত। ১ম, ৩য় আর ৫ম দিন বাড়িতে কেটেছে, কৌতূহলী আনন্দের মধ্যে দিয়ে। ২য় দিন বালীগঞ্জে মামার বাড়িতে মামার[১৫] সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কেটেছে, ৪র্থ দিন সদ্য স্থানান্তরিত দাদা-বৌদির[১৬] সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে কেটেছে সবচেয়ে ভয়ানক ভাবে। সেদিনকার ছোট্ট বর্ণনা দিই, কেমন? সেদিন সকাল থেকেই মেজাজটা বেশ অতিমাত্রায় খুশি ছিল, একটা সাধু সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, 'সেই চিঠি গোপনকারিণী' বৌদির কাছে, কারণ কয়েক দিন দাদার নতুন বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে নিজের পৌরুষের ওপর ধিক্কার এসেছিল, তাই ঠিক করলাম, নাঃ, আজ বৌদির সঙ্গে আলাপ করে ফিরবই, যে বৌদির সঙ্গে আগে এত প্রীতি ছিল, যার সঙ্গে কতদিন লুকোচুরি খেলেছি, সাঁতার কেটেছি, রাতদিন এবং বহু রাতদিন বকবক করেছি, সেই বৌদির সঙ্গে কি আর সামান্য দরজা খোলার ব্যাপার নিয়ে রাগ করে থেকে লাভ আছে? অবিশ্যি এতখানি উদারতার মূলে ছিল সেদিনকার কর্মহীনতা, যেহেতু Examination হয়ে গেছে, রাজনৈতিক কাজও সেদিন খুব অল্পই ছিল, সুতরাং মহানুভব (!) সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর বৌদির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। প্রথমে, দাদা না-থাকায় বৌদিই প্রথম কথা কয়ে লজ্জা ভেঙে দিয়ে অনেক সুবিধা করে দিলেন, তারপর ক্রমশ অল্পে-অল্পে বহু কথা কয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে, বৌদির স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনে পরিতোষ লাভ করে, তারপর কিছু রাজনৈতিক কাজ ছিল, সেগুলো সেরে সন্ধ্যায় বৌদির ওখানে পুনর্গমন করলুম এবং সদ্য আলাপের

খাতিরে বৌদির পরিবেশিত চা পান করে আবার বকবক করতে লাগলুম। ৮॥ টার সময় বাড়ি যাব ভেবে উঠলাম এবং সেদিন সেখানে থাকব না শুনে বৌদি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু দাদা এসে পড়ায় সেদিন আর বাড়ি ফেরা হল না। কিছুক্ষণ গল্প করার পর, ৯-১০ এমনি সময় সেদিনকার সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটল, বৌদি সহসা বলে উঠলেন, বোধহয় সাইরেন বাজছে ; রেডিও চলছিল, বন্ধ করতেই সাইরেনের মর্মভেদী আর্তনাদ কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দাদা তাড়াহুড়ো করে সবাইকে নীচে নিয়ে গেলেন এবং উৎকণ্ঠায় ছুটোছুটি, হৈ-চৈ করে বাড়ি মাৎ করে দিলেন। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে জাপানী বিমানের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু স্তব্ধ। আর শুরু হয়ে গেল দাদার 'হায়', 'হায়', বৌদির থেকে থেকে সভয় আর্তনাদ, আর আমার অবিরাম কাঁপুনি। ক্রমাগত মন্থর মুহূর্তগুলো বিহ্বল মুহ্যমানতায়, নৈরাশ্যে বিঁধে-বিঁধে যেতে থাকল, আর অবিশ্রান্ত এরোপ্লেনের ভয়াবহ গুঞ্জন, মেসিনগানের গুলি আর সামনে পিছনে বোমা ফাটার শব্দ। সমস্ত কলকাতা একযোগে কান পেতে ছিল সভয় প্রতীক্ষায়, সকলেই নিজের নিজের প্রাণ সম্পর্কে ভীষণ রকম সন্দিগ্ধ। দ্রুতবেগে বোমারু এগিয়ে আসে, অত্যন্ত কাছে বোমা পড়ে আর দেহে মনে চমকে উঠি, এমনি করে প্রাণপণে প্রাণকে সামলে তিনঘণ্টা কাটাই। তখন মনে হচ্ছিল, এই বিপদময়তার যেন আর শেষ দেখা যাবে না। অথচ বিমান আক্রমণ তেমন কিছু হয় নি, যার জন্য এতটা ভয় পাওয়া উচিত। কালকের আক্রমণে অবশ্য অত্যন্ত সুস্থ ছিলাম।

বোমার ব্যাপার বর্ণনা করতে দু'পাতা লাগল। কাগজের এত দাম সত্ত্বেও আরও দু'পাতা লিখছি। তোর শেষ চিঠিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের[২৭] সঙ্গে 'আলাপ করা' ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলি, কিন্তু তার আগেই বোধহয় একদিন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে P. C. Joshi-র এক বক্তৃতা-সভায় সুভাষ নিজেই এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল এবং আমার "কোনো বন্ধুর প্রতি"

কবিতাটির প্রশংসা করে দুঃখের সঙ্গে জানায় কবিতাটি তার পকেট থেকে হারিয়ে গেছে নচেৎ তা ছাপা হত। তারপর অনেকদিন পরে সুভাষের কথামতো একটা সংকলন গ্রন্থের জন্য রচিত কবিতা নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। সেদিন প্রায় দু'ঘণ্টা সেখানে থেকে সুভাষের অন্তরঙ্গ হয়েছিলাম, স্বর্ণকমলের[১৮] সঙ্গেও বেশ গল্প জুড়ে ছিলাম। সেদিন সুভাষ আমার এত প্রশংসা করেছিল যা সহসা চাটুকারিতা বলে ভ্রম হতে পারত, সুভাষও আমাকে বই ছাপাতে বললে। তোর কবিতাটির ব্যবস্থা তোর চিঠির ইচ্ছামতোই হয়েছে। সংকলন গ্রন্থটি 'এক সূত্রে' নাম নিয়ে বুদ্ধদেব, বিষ্ণু, প্রেমেন্দ্র, অজিত দত্ত, সমর সেন, অচিন্ত্য, অন্নদাশঙ্কর, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ বাংলার ৫৫ জন কবির কবিতা নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এবং তার মধ্যে আমার একটি কবিতাও সসংকোচে স্থান পেয়েছে। ভাল কথা, জীবুর একখানা 'কবিতা' তোর কাছে ছিল, কিন্তু তোর বাবার কাছ থেকে সেখানা এখনও পাই নি, তাই অপর ক'খানাও দেওয়া হয় নি ;—অত্যন্ত লজ্জার কথা। এবার 'আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীলা' মেয়েটির কথা বলছি। তোকে চিঠিতে জানান ঘটনার পর একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমাকে দেখেই বিস্ময়ে উচ্ছ্বাসে মর্মরিত হয়ে উঠলেন। আমিও আবেগের বন্যায় একটা নমস্কার ঠুকে দিলাম, তিনিও প্রতিনমস্কার করে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে দরজা খুলে দিলেন। আমি রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' সঙ্গে এনেছিলাম তাঁকে দেবার জন্যে, সেখানা দিয়ে গল্প শুরু করে দিলাম এবং অনেকক্ষণ গল্প করার পর বিদায় নিয়েছিলাম। সেদিন তাঁর প্রতি কথায় বুদ্ধিমত্তা, সৌহার্দ্য এবং সারল্যের গভীর স্পর্শ পেয়েছিলাম এবং বিদায় নেবার পর পথ চলতে-চলতে বারবার মনে হয়েছিল, সেদিন যে কথোপকথন আমাদের মধ্যে হয়েছিল তার মতো মূল্যবান কথোপকথনের সুযোগ আমার জীবনে আর আসে নি। মেয়েটি স্নিগ্ধতার একটি অপরূপ বিকাশ, তাঁর মধ্যে শহুরে চটুলতা, কুটিলতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র

আবিলতার কোনো আভাস পেলাম না। অথচ তাঁর মধ্যে সুরুচি ও সংস্কৃতির অভাব নেই, সর্বোপরি পরিপূর্ণতার এক গভীর নীরবতা গ্রাম্য আবেষ্টনীর মতো সর্বদা বিরাজমান। তবুও সেদিন সুস্থ হয়ে কথা বলতে পারি নি। যেহেতু আমি পুরুষ, তিনি নারী।

এইবার আমার প্রেম-কাহিনীর শেষ অধ্যায় বিবৃত করছি। কিছুদিন আগে, কতদিন আগে তা মনে নেই – বোধহয় দু'মাস হবে, একদিন···কে···দের বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়েছিল। পথে নেমে বহুক্ষণ চলতে থাকলুম গুনগুন করতে করতে, যতদূর মনে পড়ে "চাঁদ উঠেছিল গগনে"। প্রায় অর্ধেক রাস্তা সকৌতুকে আমাদের অবস্থা অনুভব করার পর ভাবলুম, আর নয়, ব্যাপারটাকে এইখানেই শেষ করে দেওয়া যাক। একটা দম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : একটা কথা বলব ? প্রথম বার শুনতে পেল না। দ্বিতীয় বার বলতেই, মৃদু হেসে, ঔদ্ধত্যভরে, মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। বললাম : কিছুদিন আগে আমার একখানা চিঠি পেয়েছিলে ? ভ্রূকুটি হেনে ও বলল : কলকাতায় ? আমি বললুম : না, বেনারসে। ও মাথা নেড়ে প্রাপ্তি সংবাদ জ্ঞাপন করলে। আবার একটু দম নিয়ে বললাম : অত্যন্ত অসতর্ক অবস্থায়, আবেগের মাথায় পাগলামি করে ফেলেছিলাম। সেজন্য আমি এখন অনুতপ্ত এবং এইজন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। ও তখন অত্যন্ত ধীরভাবে বিজ্ঞের মতো বললে—না-না, এজন্যে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই, ঐ রকম মাঝে-মাঝে হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ চলবার পর জিজ্ঞাসা করলুম : আচ্ছা আমার চিঠিখানার জবাব দেওয়া কি খুব অসম্ভব ছিল ? ও অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললে : উত্তর তো আমি দিয়েছিলাম। আমি তখন অত্যন্ত ধীরে-ধীরে বললাম, চিঠিখানা তাহলে আমার বৌদির হস্তগত হয়েছে। ও বিষণ্ণ হেসে বলল : তাহলে তো বেশ মজাই হয়েছে। কিছুক্ষণ আবার নিঃশব্দে কাটল। তারপর ও হঠাৎ বললে : আচ্ছা এ রকম দুর্বলতা আসে কেন ? অত্যন্ত বিরক্তিকর প্রশ্ন। বললাম : ওটা কাব্যরোগের লক্ষণ। মানুষের যখন কোনো কাজ থাকে না, তখন কোনো একটা চিন্তাকে আশ্রয় করে বাঁচতে সে উৎসুক হয়, তাই এই

রকম দুর্বলতা দেখা দেয়। তোমার চিঠি না পেয়ে আমার উপকারই হয়েছিল, আমি অন্য কাজ পেয়েছিলাম। ধর, তোমার চিঠিতে যদি সন্তোষজনক কিছু থাকত, তাহলে হয়তো আমার কাব্যের ধারা তোমাকে আশ্রয় করত। ও তাড়াতাড়ি শুধরে নিল, চিঠিটা কিন্তু সন্তোষজনক ছিল না। আমি বললুম: আমার কাব্যের ধারাও সঠিক পথে চলেছে। এরপর···বাড়ি এসে পড়েছিল।

এখন তোর খবর কি? শরীর কেমন? গ্রাম্য জীবন কি ধাতস্থ হয়েছে? তোর বাবা যে কবে এখান থেকে গেলেন, আমি জানতেও পারি নি। তোর ভাই-বোন-বাবা-মা'র কুশল সংবাদ সমেত একখানা চিঠি, যদি খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় তো পাঠাস্; নতুবা দেরি করে পাঠাস নি। কারণ বোমারু বিমান সর্বদাই পৃথিবীর নশ্বরতা ঘোষণা করছে। তোর উপন্যাসখানার বাকী কত?

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

□

দশ

20, Narkeldanga Main Road
Calcutta
15. 2. 43.

প্রীতিভাজনেষু,

আমি কিছুদিন আগে একটা বিপুলবপু চিঠিতে অজস্র বাজে কথা লিখে পাঠিয়েছিলাম—নেহাৎ চিঠি লেখার জন্যেই। সেখানা হস্তগত হয়েছে শুনে নির্ভয় হলাম। ও চিঠির উত্তর না-পাওয়া আমায় বিচলিত করে নি, যেহেতু ঐ চিঠিটার উত্তর দেবার মতো মূল্য ছিল না। আমার খবর আমি এক কথায় জানাচ্ছি—পরিবর্তনহীনভাবে রাজনীতি নিয়ে কালক্ষয় করছি। তোরা একটা 'পত্রিকা'[১১] বার করছিস। ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই, হাতের-লেখা পত্রিকা বার

করবার মতো মনের অপরিপক্কতা তোর আজো আছে? কথাটা নীরস হলেও একথা বলবই যে, এই ধরনের 'খই ভাজায়' এই দুর্দিনে কাগজ ও সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। নিজের সম্বন্ধে তোর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে, নিজেকে নানাভাবে সৎশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং সেইজন্য পত্রপাঠ কলকাতা এসে বাবার সাহায্য নেওয়া। কথাটা গুরুমশাইয়ের উপদেশ অথবা বাবার নিবেদনের মতো তিক্ত ও অনাবশ্যক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি। কথাটার তাৎপর্য আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি এবং যথাসাধ্য সে সম্বন্ধে চেষ্টা ও আয়োজন করছি। অতএব আমার কথাটা ভাল করে ভেবে দেখবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি, মা এবং ভাই-বোন সহ তুই ভাল আছিস : তোর প্রীতিপ্রাপ্তরা ভাল আছে, চিঠির উত্তর চাই না।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য।

□

এগারো

20, Narkeldanga Main Road
3. 3. 43

প্রিয়বরেষু,

অরুণ! তোর কাছ থেকে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ চিঠি ইতিপূর্বে আর কখনও পাই নি। তার কারণ বিবৃত করছি। প্রথমত চিঠিটা নৈহাটি, দৌলৎপুর, ডোঙ্গাঘাটা, পাঁজিয়া—এই চার জায়গায় fountain pen, pencil এবং কলমে লেখা বলে এত বিচিত্র। দ্বিতীয়ত সমস্ত চিঠিটায় একজন কেজো লোকের ব্যস্ততার সাড়া পাওয়া গেল। তৃতীয় কারণ, চিঠিটার অপ্রত্যাশিততা।

চিঠির উত্তর দিতে তোকে নিষেধ করেছিলাম, তবুও তোর চিঠি

পেয়ে আশান্বিত হয়ে পড়ে দেখলাম চিঠিটা নেহাৎ নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ Official। যদিও সংশিক্ষা সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ আছে, তবুও সেটা গৌণ—মুখ্য হচ্ছে 'ত্রিদিব'। এজন্যে আমি দুঃখিত হই নি বরং কৌতুক অনুভব করেছি। অবিশ্যি খামখানাই এজন্যে দায়ী।

'ত্রিদিবে'র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার আশা গভীর হল যশোহরের সংকীর্ণতা থেকে সারা বাংলাদেশেই এর পরিব্যাপ্তি ও সম্প্রসারণ দেখে। পত্রিকাটি নতুন লেখক ও শিল্পীদের প্রাণরসে পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক হয়ে একদিন সারা বাংলার ক্ষুধা মেটানোর জন্যে পরিবেশিত হবে, সূচনা দেখে এ-অনুমান করা খুব সম্ভবত আমার অদূরদর্শিতায় পর্যবসিত হবে না।

তুই যে আমার আন্তরিকতায় দিন-দিন সন্দিহান হচ্ছিস, ক্রমশ তার পরিচয় পাচ্ছি। কারণ ও প্রমাণ মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলে দেখাব। তুই কবে আসছিস—এইটা জানবার জন্য উৎসুক আছি। আর এইটাই আমার কাছে সবচেয়ে জরুরী। তুই বোধহয় কোনো কার্যব্যপদেশে এখানে আসছিস, তার কারণ তুই অধুনা কাজের লোক হয়ে পড়েছিস, কিন্তু আমি চাই বেশ কিছু সময় হাতে নিয়ে তুই আসবি।

তোর সদ্যলব্ধ দিদি আর কাকীমার সম্বন্ধে রীতিমত কৌতূহল দেখা দিয়েছে। আর, কিছু পরিচয় পেলাম তোর সূক্ষ্ম বর্ণনায়, তারা যে সাহিত্য-রসিক তার নমুনা পাওয়া গেল পাঠস্পৃহা থেকে।

তোদের (থুড়ি) আমাদের 'ত্রিদিব' সম্বন্ধে একটা বড় সত্য অনুমান করছি যে, আমরা এই পাপ-দুঃখ-কষ্ট আকীর্ণ ধরণীর নগণ্য লোক কর্মদোষে 'ত্রিদিবে'র দর্শন পাচ্ছি না। আশা করি তোর সঙ্গলাভের পুণ্যে হয়তো পাপস্খলন হবে এবং তখন এক সংখ্যার দর্শনলাভও হবে।

তুই লিখেছিস, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' (স্বভাব নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজের সম্বন্ধে একটা সত্যি কথা বলেছিস দেখে তৃপ্ত হলুম), সত্যিই

তোর স্বভাবের এতদূর অধঃপতন হয়েছে যে দুটো বাজে লেখা তুলে দিয়ে স্বচ্ছন্দে নিজের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি করে নিশ্চিন্ত হলি? ভাল।

আর একটা গুরুতর কথা। তুই নিজে না 'সম্পাদক' হয়ে কোন এক সুনীল বসুকে 'সম্পাদক' করেছিস কেন? তোর চেয়ে যোগ্য লোক ডোঙাঘাটা তথা সারা যশোরে আছে নাকি? এটা একটা আশাভঙ্গের কথা।

কবিতা পাঠাচ্ছি। 'আহ্নিক' বলে যে কবিতাটি লিখেছিলাম সেটা দিতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু সেটা এখন পাচ্ছি না, পেলে পরে পাঠাব। এখন অবশ্য একটা লেখা (দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক[২০]) পাঠালুম। বইয়ের লিস্ট[২১] পাঠালুম—তবে সংক্ষিপ্ত। বিস্তৃত পরে পাঠাব। চিঠির উত্তরের পরিবর্তে তোকে পেতে চাই। তোদের সকলের কুশল কামনা করি।

চিঠিখানা চেষ্টা করে বড় করলুম না, আর তোর যে-যে অনুরোধ, তার সব পালন করা হয়েছে। ইতি—

—সুকান্ত

আরো একটু—চিঠিখানা ৩রা মার্চ লেখা হলেও, পোস্ট অফিসে পয়সা নিয়ে গিয়েও নানা কারণে বিতাড়িত হয়েছিলাম দিন কয়েক। তা ছাড়া শুনলাম তুই নাকি আবার সফরে বেরিয়েছিস। তাই মনে হচ্ছে, পত্রপাঠ চিঠিটা পাঠাতে না-পারলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। আর কবিতা যেটা পাঠালুম সেটা প্রধানত অতিরিক্ত সহজবোধ্য বলেই আমার মতে (বোধহয় তোর মতেও) অত্যন্ত খারাপ, সেজন্যে দুঃখ করিস নি। সবুরে মেওয়া ফলবে। তুই আজকাল ছবিটবি আঁকছিস আশা করি, কবিতা বোধহয় খুব ভাল লিখছিস।

সু
কা
ন্ত।

বারো

অরুণ।

নানা রকম সঙ্কটের জন্য তোর চিঠির জবাব দিই নি, পরে একটা বড় চিঠি পাঠাব। তুই এখানে আসবি বলেছিলি, কিন্তু তার কোনো উদ্যোগ দেখছি না। অবিলম্বে তোর এখানে এসে স্থায়ীভাবে পড়াশুনা আরম্ভ করা দরকার। তুই তোর পরমহিতাকাঙ্ক্ষী বাবার অবর্ণনীয় এবং অবিরাম পরিশ্রমের কথা ভুলে, তাঁর চিঠির উত্তর না দিয়ে, স্বচ্ছন্দে 'ত্রিদিব' নিয়ে কাল কাটাচ্ছিস? তাঁর প্রতি এতবড় অকৃতজ্ঞতা অসহনীয়।[২২]

সুকান্ত

□

তেরো

চিঠিটার উত্তর দিতে বেশ একটু দেরি হল, বোধহয় কুড়ি-বাইশ দিন; কিন্তু সেজন্যে আমি এতটুকু দুঃখিত নই—যেহেতু আর্থিক প্রতিকূলতা (শুধু অর্থনৈতিক অরাজকতার জন্যে নয়, পারিবারিক আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুন) ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে আমাকে, এমন কি আমার ভবিষ্যৎকে পর্যন্ত। অবিশ্যি আর কিছু পরিবর্তন পরিবারের আর কোথাও হয় নি, কেবল আমার পৃথিবীতেই দেখা দিয়েছে বিপর্যয়। বেশ স্কুলে যাচ্ছিলাম, রাজনীতির চর্চা করছিলাম, এমন সময় এল কালবৈশাখীর মতো বিনা নোটিশে এক ঝড়, যা আমার চোখে ধুলো ছিটিয়ে দিল, আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম, আর সে বিভ্রান্তির ঘোর এখনো কাটে নি। যাক, চিঠির প্রথমেই করুণ রসের অবতারণা করা অরসিকের পরিচয়। আমার অবস্থা অনেকটা কবি বলে যে গল্পটা লিখেছিলাম সেই গল্পটার নায়কের মতো হয়েছে, আশা করি এ দুর্দিন দূরীভূত হবে।

সম্পাদনার জন্যে তোর চেয়ে যোগ্য লোক আছে কিনা, তোদের বর্তমান যশোরে, (অর্থাৎ যেখানে অরুণ মিত্র, সরোজ দত্ত[২৩] উপস্থিত নেই) এ প্রশ্ন তুলে তোকে আঘাত দিয়েছি জেনে আমিও প্রত্যাঘাত পেলাম। তোর ভুল বোঝবার এই অপচেষ্টা দেখে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মেষিত হল। আমার উচিত ছিল মনোজ বসু কোন ছার, মাইকেলকে স্মরণ করা। তাঁরা 'ত্রিদিব' সম্পাদনা করতে পারুন, আর নাই পারুন, জন্ম তো নিয়েছেন যশোহরে।

ভাল কথা, এর আগে যে চিঠিটা তোর বাবার সঙ্গে গেছে সেটা অনেকটা ফজলুল হকের মতোই বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে লেখা, সুতরাং তার রসহীনতায় ক্ষুব্ধ হ'স নি। তবে চিঠির কথাগুলো অত্যন্ত সার কথা, একবার ভাল করে ভেবে দেখিস।

আর গল্প বা প্রবন্ধ সম্বন্ধে কথা হচ্ছে যে, ওগুলো অন্তত এখন অর্থাৎ সাময়িকভাবে, পাঠান সম্ভবপর নয়, কারণ আমার পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। তবে কবিতা পাঠাতে পারি, যা চাস।

মামাকে[২৪] গল্প লিখতে বলেছি, সে লিখে চলেছে ; শেষ হলেই পাঠিয়ে দেবে। আর মহিলা লেখিকা সংগ্রহ করেছি একজন, তিনি অসুস্থ, সুস্থ হলেই লেখা দেবেন। মহিলা লেখিকা সংগ্রহ করতে গিয়ে এক মজার কাণ্ড করেছিলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে, ভূপেনের এক বৌদি আছেন, অত্যন্ত ভালমানুষ। তাঁকে একদিন এমন চেপে ধরেছিলাম সাঁড়াশির মতো লেখা আদায়ের জন্য, যে তিনি কেঁদে ফেলবার উপক্রম করেছিলেন। কারণ প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে নাছোড়-বান্দার মতো ব্যাকুল হয়ে লেখা চাইছিলাম, পরিশেষে পায়ে ধরার যখন আয়োজন করলাম তখন দেখি তাঁর অবস্থা শোচনীয়, কাজেই আখমাড়াই কলের মতো অলেখিকার কাছ থেকে লেখা আদায়ের দুশ্চেষ্টা ছেড়ে দিলাম।

তোর ত্রিদিবের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে জেনে সুখী হলাম, কিন্তু তার তুলনায় তোর যদি ঐ সঙ্গে ঐ রকম উন্নতি হত তবে আহ্লাদে

আটখানা হতাম। তুই কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, এমন কি লেখাপড়া পর্যন্ত ছেড়ে দিলি? তোর চিঠি থেকে অনুমান করা যায় তুই ত্রিদিবের সঙ্গে খুব বেশী জড়িত নোস্। অথচ এত ব্যস্ত কেন? কিছুই বোঝবার উপায় নেই; এ সবের রহস্য এক তুই জানিস আর জানে তোর ত্রিদিব। আমরা মর্ত্যের লোক ত্রিদিবের ব্যাপার কী বুঝব?

আর একটা ব্যাপারে বিস্মিত ও বিচলিত হলাম, তুই নাকি আমাকে বিভাগীয় সম্পাদক করেছিস? এ ব্যাপারে কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের বাঁশের মাথায় হাঁড়ি চড়িয়ে ভাত রান্নার গল্প অত্যন্ত অন্যায়-ভাবে মনে পড়ে গেল। এর মধ্যে কোনো নতুনতর অভিসন্ধি আছে নাকি? না, এ বন্ধুত্ব বজায় রাখবার অভিনব কৌশল?

অমূল্যদার শোকে আমিও দুঃখিত হলাম এবং তা মৌখিক নয়। অমূল্যদার সঙ্গে দেখা হলে বলিস, তিনি যদি কখনো কলকাতায় আসেন আমার সঙ্গে যেন দেখা করেন, তাঁকে আমার ঠিকানা দিস।

তুই লিখেছিস, আমার লেখা না পেলে তোর কাগজ বন্ধ হয়ে যাবে, যখন লিখেছিস, তখন হয়তো ঐ অবস্থা ছিল, এখন সে দুর্ভিক্ষ কেটে গেছে। এই ভেবে ভরসা করে ব্যয়ের নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করলুম।

এই মাসের 'পরিচয়ে' আমার কবিতা আর গত সংখ্যা (অর্থাৎ ত্রিশ সংখ্যা) 'অরণি'তে আমার গল্প বেরিয়েছে। 'পরিচয়' বোধহয় তোদের ওখানে কেউ নেয় না, কিন্তু 'অরণি' নেয় জানি, সুতরাং ঐ সংখ্যা 'অরণি' জোগাড় করে তুই পড়িস এবং মাকে পড়াস আর এই চিঠির উত্তরে গল্পটা সম্বন্ধে মূল্যবান মতামত জানাস।

পরিশেষে এই বলে বিদায় নিচ্ছি যে, একদিকে বাইরের খ্যাতি, সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করছি, অন্যদিকে.....আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যৎকে চূর্ণ করে দিচ্ছে। আমার শিক্ষা জীবনের ওপর এতবড় আঘাত আর আসে নি, তাই বোধহয় এত

নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে এই স্বাভাবিকতাকে, তাই সমস্ত শিরা—শিরার রক্তে রক্তে ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিবাদ।

চিঠির উত্তর দিস[২৫]। ইতি—

সুকান্ত ভট্টাচার্য

[২৭শে চৈত্র ১৩৪৮]

□

চৌদ্দ

১২ অনন্তপুর, পোঃ হিনু, রাঁচি

অরুণ,

অনেক ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে অনেক অবিশ্বাস আর অসম্ভবকে অগ্রাহ্য করে শেষে সত্যিই রাঁচি এসে পৌঁছেছি। আসার পথে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখি নি, কেবল পূর্ণিমার অস্পষ্ট আলোয় স্তব্ধ গভীর বরাকর নদীকে প্রত্যক্ষ করেছি।

তখন ছিল গভীর রাত—(বোধহয় রাত শেষ হয়েই আসছে) আর সেই রাত্রির গভীরতা প্রতিফলিত হচ্ছিল সেই মৌন মূক বরাকরের জলে। কেমন যেন ভাষা পেয়েছিল সব কিছুই। সেই জল আর অদূরবর্তী একটা বিরাট গম্ভীর পাহাড় আমার চোখে একটা ক্ষণিক স্বপ্ন রচনা করেছিল।

বরাকর নদীর এক পাশে বাঙলা, অপর পাশে বিহার আর তার মধ্যে স্বয়ং-স্ফূর্ত বরাকর; কী অদ্ভুত, কী গম্ভীর! আর কোনো নদী (বোধহয়, গঙ্গাও না) আমার চোখে এত মোহ বিস্তার করতে পারে নি।

আর ভাল লেগেছিল গোমো স্টেশন। সেখানে ট্রেন বদল করার জন্যে শেষ রাতটা কাটাতে হয়েছিল। পূর্ণিমার পরিপূর্ণতা সেখানে উপলব্ধি করেছি। স্তব্ধ স্টেশনে সেই রাত আমার কাছে তার এক অস্ফুট সৌন্দর্য নিয়ে বেঁচে রইল চিরকাল।

তারপর সকাল হল। অপরিচিত সকাল। ছোট ছোট পাহাড়, ছোট-ছোট বিশুষ্কপ্রায় নদী আর পাথরের কুচি-ছিটানো লালপথ, আশেপাশে নাম-না-জানা গাছপালা ইত্যাদি দেখতে দেখতে ট্রেনের পথ ফুরিয়ে গেল।

তারপর রাঁচি রোড ধরে বাস-এ করে এগোতে লাগলুম। বাসের কী শিংভাঙা গোঁ! সে বিপুল বেগে ধাবমান হল পাহাড়ী পথ ধরে। হাজার হাজার ফুট উঁচু দিয়ে চলতে চলতে আবেগে উছলে উঠেছি আর ভেবেছি এ-দৃশ্য কেবল আমিই দেখলুম; এই বেগ আর আবেগ কেবল আমাকেই প্রমত্ত করল! হয়তো অনেকেই দেখেছে এই দৃশ্য, কিন্তু তা এমন করে অভিভূত করেছে কাকে?

রাঁচি এসে পৌঁছলাম। আমরা যেখানে থাকি, সেটা রাঁচি নয়, রাঁচি থেকে একটু দূরে—এই জায়গার নাম ডুরাণ্ডা। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণস্রোতা সুবর্ণরেখা নদী। আর তারই কূলে দেখা যায় একটা গোরস্থান। যেটাকে দেখতে-দেখতে আমি মাঝে সাঝে আত্মহারা হয়ে পড়ি। সেই গোরস্থানে একটা বটগাছ আছে, যেটা শুধু আমার নয় এখানকার সকলের প্রিয়। সেই বটগাছের ওপরে এবং তলায় আমার কয়েকটি বিশিষ্ট দুপুর কেটেছে।

গত শুক্রবার সকাল থেকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণ আমাদের অনির্বচনীয় আনন্দে কেটেছে—কারণ, এই সময়টা আমরা দলে ভারি ছিলাম। রবিবার দুপুরে আমরা রাঁচি থেকে ১৮ মাইল দূরে 'জোন্‌হা প্রপাত' দেখতে বেরুলাম। ট্রেনে চাপার কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমুল বৃষ্টি নামল এবং ট্রেনে বৃষ্টির আনন্দ আমার এই প্রথম। দুধারে পাহাড়-বন ঝাপসা করে, অনেক জলধারার সৃষ্টি করে বৃষ্টি আমাদের রোমাঞ্চিত করল।

কিন্তু আরো আনন্দ বাকী ছিল—প্রতীক্ষা করে ছিল আমাদের জন্যে জোন্‌হা পাহাড়ের অভ্যন্তরে। বৃষ্টিতে ভিজে অনেক পথ হাঁটার পর সেই পাহাড়ের শিখরদেশে এক বৌদ্ধ-মন্দিরের সামনে এসে

দাঁড়ালাম। মন্দির-রক্ষক-এসে আমাদের দরজা খুলে দিল। মন্দিরের সৌম্য গাম্ভীর্যের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম নিঃশব্দে, ধীর পদক্ষেপে। মন্দির-সংলগ্ন কয়েকটি লোহার দুয়ার এবং গবাক্ষবিশিষ্ট কক্ষ ছিল। সেগুলি আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম, ফুল তুললাম, মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি করলাম: সেই ধ্বনি পাহাড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল, বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছলো না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। সেই অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়ে বাঘের ভয় অত্যন্ত বেশী! আমরা তাই মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। তারপর গেলাম অদূরবর্তী প্রপাত দেখতে!—গিয়ে যা দেখলাম তা আমার স্নায়ুকে, চৈতন্যকে অভিভূত করল। এতদিনকার অভ্যস্ত গতানুগতিক দৃষ্টির ওপর এ একটা সত্যিকারের প্রলয় হিসেবে দেখা দিল। মুগ্ধ সুকান্ত তাই একটা কবিতা না-লিখে পারল না। সে-কবিতা আমার কাছে আছে, ফিরে গিয়ে দেখাব। জোন্‌হা যে দেখেছে, তার ছোটনাগপুর আসা সার্থক। যদিও হুড্রু খুব বিখ্যাত প্রপাত, কিন্তু হুড্রুতে 'প্রপাত' দর্শনের এবং উপভোগের এত সুবিধা নেই—একথা জোর করেই বলব। এবং জোন্‌হা যে দেখেছে সে আমার কথায় অবিশ্বাস করবে না। জোন্‌হা সব সময়েই এত সুন্দর, এত উপভোগ্য, তা নয়; এমন কি আমরা যদি তার আগের দিনও পৌঁছতাম তা হলেও এ-দৃশ্য থেকে বঞ্চিত থাকতাম নিশ্চিত।

প্রপাত দেখার পর সন্ধ্যার সময় আমরা বুদ্ধদেবের বন্দনা করলাম। তারপর গল্পগুজব করে, সবশেষে নৈশ ভোজন শেষ করে আমরা সেই স্তব্ধনিবিড় গহন অরণ্যময় পাহাড়ে জোন্‌হার দূর-নিঃসৃত কলধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

জোন্‌হা সারারাত বিপুল বেগে তার গৈরিক জলধারা নিষ্ঠুরভাবে আছড়ে আছড়ে ফেলতে লাগল কঠিন পাথরের ওপর, আঘাত-জর্জর জলধারার বুকে জেগে রইল রক্তের লাল আর রুদ্ধ ঘরে শোনা যেতে লাগল আমাদের ক্লান্ত নিঃশ্বাস। প্রহরীর মতো জেগে রইল ধ্যানমগ্ন

পাহাড় তার অকৃপণ বাৎসল্য নিয়ে, আর আমাদের সমস্ত ভাবনা ঢেলে দিলাম সেই বিরাটের পায়ে।

পরদিন আর একবার দেখলাম রহস্যময়ী জোন্‌হাকে। তার সেই উচ্ছল রূপের প্রতি জানালাম আমার গভীরতম ভালবাসা। তারপর ধীরে-ধীরে চলে এলাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আসার সময় যে-বেদনা জেগেছিল, বিদায়ের জন্যে তা আর ঘুচল না—সেইদিনই দুপুরে আমাদের দলের অর্ধেককে বিদায় দিয়ে সেই বেদনা দীর্ঘস্থায়ী হল। জোন্‌হার ফিরতিপথে, ফেরার সময় মনে-মনে প্রার্থনা করেছিলাম, আমাদের এই যাত্রা যেন অনন্ত হয়। কিন্তু পথও ফুরাল, আর আমরাও জোন্‌হাকে ফেলে, সেই আশ্রয়দাতা বুদ্ধমন্দিরকে ফেলে রাঁচি চলে এলাম। এ-থেকে বুঝলাম, কোনো কিছুর আসাটাই স্বপ্ন—আর যাওয়াটা কঠোর বাস্তব। খুব কম জিনিসই কাছে আসে; কিন্তু যায় প্রায় সব কিছুই। জোন্‌হাই তার বড় প্রমাণ।

রাঁচি ফেরার পর আমাদের দলের অর্ধাঙ্গ হানি হওয়ায় আনন্দও প্রায় সেই সঙ্গে বিদায় নিয়েছে। তবু এরই মধ্যে দুদিন রাঁচি-পাহাড়ে গেছি এবং উল্লসিত হয়েছি। এই পাহাড় থেকে রাঁচি শহরকে দেখায় ভারি সুন্দর। মনে হয়, 'লিলিপুটিয়ান'রা গড়েছে তাদের সাম্রাজ্য। শহরের মধ্যে একটি 'লেক' আছে, আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃশ্যপটও ঘন-ঘন বদলায়, এবং শহরের সৌন্দর্যের জন্যে আমার মনে হয় লেকটিই অনেকখানি দায়ী।

রাঁচি পাহাড়ের মাথায় আছে একটি ছোট্ট শিবের মন্দির। সেই মন্দিরে দাঁড়িয়েই দেখা যায় ছোটনাগপুরের দিগন্ত যেন পাহাড় দিয়ে ঘেরা। আর আছে একটি গুহা, সেটিও কম উপভোগ্য নয়। আর সব মিলিয়ে দেখা যায় রাঁচির অখণ্ড সত্ত্বাকে, যা একমাত্র রাঁচি-পাহাড় থেকেই দেখা সম্ভব।

'ডুরাণ্ডার বাঁধ' বলে একটা জিনিস আছে, যেটিতে আমি একদিন স্নান করেছি এবং এক সন্ধ্যায় যাকে হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি দিয়ে

অনুভব করেছি। এটিকে পুকুর বলাই ভাল, বড়জোর দীঘি। কিন্তু সবাই একে 'লেক' বলে থাকে। যাই হোক, জলাশয় হিসেবে এটিকে আমার খুব ভাল লেগেছে। আর, তা ছাড়া ডুরাণ্ডার পথ, মাঠ, বন সবই ভাল। এক কথায়, ভাল এখানকার সবই। কেবল ভাল নয় এখানকার প্রতিবেশী, বাজারের দূরত্ব আর মিলিটারীদের আধিপত্য।

এখানে এখন মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। যদিও বৃষ্টিটা এখানে ঠিক খাপ খাচ্ছে না, তবুও এই বৃষ্টি কাল অসাধ্য সাধন করেছে—ক্ষীণস্রোতা সুবর্ণরেখার বুকে এনেছে যৌবন। তার কল্লোলময় জলোচ্ছ্বাসে, তার স্রোতের বেগে আর ঢেউয়ের মাতামাতিতে আমরা শিহরিত হয়েছি। কারণ কাল সকালেও সুবর্ণরেখার মাঝখানে দাঁড়ালে পায়ের পাতা ভিজত না।

যাই হোক, রাঁচির অনেক কিছুই এখনো দেখিনি। কিন্তু যা-দেখেছি তাতেই পরিতৃপ্ত হয়েছি—অর্থাৎ রাঁচি আমার ভাল লেগেছে। যদিও রাঁচির বৈচিত্র্য ক্রমশ আমার কাছে কমে আসছে আর আজকাল সব দিনগুলোর চেহারাই প্রায় একরকম ঠেকছে। অতএব বিদায়—

সুকান্ত ভট্টাচার্য

পুনশ্চ :—আমার ফিরতে বেশ দেরি হবে। ততদিন···ভাইকে তদারক করিস দয়া করে। কারণ, এখানকার প্রাকৃতিক আকর্ষণের চেয়ে পারিবারিক আকর্ষণ বেশি ; কবে যাব, তার ঠিক নেই। 'বন্যা'র কাজ কতদূর ? চিঠির উত্তর দিস।[২৬]

সু. ভ.

□

পনেরো

শ্যামবাজার, কলিকাতা

অরুণ,

আমি এখনও এখানেই আছি। অথচ 'আমি কেমন আছি' এই খবরটা নেবার যে তোর দরকার হয় না, এইটাই আমাকে বিস্মিত করেছে। যদিও বুঝি যে এর পেছনে রয়েছে তোর Duty-র

প্রতিকূলতা। (তোর কোনো অসুখ হয় নি তো?) তাই তোর ঔদাসীন্যকে সহজেই ক্ষমা করা যায়।

যাই হোক, কাল (২২।১২।৪৩) তুই তোর 'Duty' ৩টেয় শেষ করে অন্যান্য কাজ আধ ঘণ্টায় সেরে ৪টের মধ্যে এখানে আসবি বাসে চেপে। সঙ্গে Govt. Art School-এ Exhibition দেখতে যাবার মতো গাড়িভাড়াও আনিস। তোর অসুখ না হয়ে থাকলে আশা করি আমার এ-অনুরোধ পালিত হবে।

২১।১২।৪৩ —সুকান্ত

□

ষোল

অরুণ!

বিয়ের দিন[২৭] সকাল বেলায় তোর চিঠি পেলাম। তোর কথা মতো শুধু বিশ্বনাথকে 'জনযুদ্ধ' দেওয়ার সুযোগ পেলাম না বিয়ের কাজের চাপে। অন্য অনুরোধগুলো রাখবার চেষ্টা করব।

এই চিঠির প্রধান আলোচ্য বিষয় বিয়ে এবং বিয়েও হয়ে গেল দুদিন হল। আজ ফুলশয্যা। বিয়েটা আমার ভাল লাগেনি, বরং খুব নিরানন্দেই কেটেছে। বিশেষ করে আদর এবং সম্মান পাওয়ায় অভ্যস্ত আমি, মোটেই সম্মান পাই নি কোথাও, ভাঁড়ের মতো আমার অবস্থা।

বিয়ের দিন বিকেলে এসে···রাত্রিতে ফিরে গিয়েছিল। আবার কাল সন্ধ্যায় এসে 'যাই-যাই' করেও রয়ে গেছে। এইমাত্র ও এই ঘরে শুয়ে লেনিনের জীবনী পড়তে পড়তে উঠে গেল। (ওর নম্রতায় আমি মুগ্ধ।) ও আমার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর চলে গেল। আমার ডানপাশে খাটের উপর ঘুমিয়ে নববধূ (মন্দ নয়)। মেঝেতে মেজবৌদি[২৮] এবং ভূপেন। বেলা প্রায় পাঁচটা। এই আবহাওয়ায় লেখা খুব অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে; কয়েক দিন বিয়ের জন্যে পার্টির কাজের কামাই হয়ে গেল। হয়তো তোদের

ওখানে যেতে পারব না ছুটি না পেয়ে। না গেলে কি ক্ষমা করতে পারবি না?

সুকান্ত ভট্টাচার্য

৯।৬।৪৪

আমি যাই আর না-যাই ১৫ তারিখের মধ্যে তুই কলকাতায় ফিরিস। ১৫ই A. I. S. F. Conference।

□

সতেরো

দোস্ত,

কয়েকটা কারণে আমার তোর ওখানে যাওয়া হল না। যেমন :

(১) কিশোর বাহিনীর দুধের নতুন আন্দোলন শুরু হল।
(১৪ই জুনের 'জনযুদ্ধ' দ্রষ্টব্য।)

(২) ১৫ই জুন A. I. S. F. Conf.

(৩) কিশোর বাহিনীর কার্ড এখনো ছাপা হয় নি। ছাপাব।

(৪) ১৩ই জুন I. P. T. A.-এর অভিনয় শ্রীরঙ্গমে।

(৫) ১১ই জুন কিশোর বাহিনীর জরুরী মিটিং।

(৬) কিশোর বাহিনীর ৪নং চিঠি এ-সপ্তাহে লিখতে হবে।

(৭) ১৩ই জুন আমাদের বাড়িতে বৌভাত।

(৮) এখন আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ।

তোদের ওখানকার কিশোর বাহিনীকে আমায় ক্ষমা করতে বলিস। নতুন আন্দোলনের জন্যে রমাকৃষ্ণ[২৯] আমায় ছাড়লো না। তোর মা আমায় ক্ষমা করবেন না জানি, কিন্তু তুই এ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি কি রকম ব্যবহার করবি সেটাই লক্ষণীয়।

তুই অনেকদিন কলকাতা ছেড়েছিস। লক্ষ্মীবাবু[৩০] এবং আমার মতে তোর এখন ফেরার সময় হয়েছে। ১৫ তারিখের মধ্যে তোর কলকাতা আসা পার্টির বাঞ্ছনীয়।[৩১]

আঠারো

অরুণ,

মনে আছে তো আজ কিশোর-বাহিনীর শারদীয় উৎসব? অশোক[৩২] যেতে চায়, ওকে নিয়ে তুই চারটের মধ্যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে পৌঁছস, আমি একটু ঘুরে যাব কিনা।[৩৩]

—সুকান্ত

□

উনিশ

বেনারস সিটি

অরুণ,

যে-ম্যালেরিয়া তোকে প্রায় নির্জীব করে তুলেছে, আমি এখানে আসার পঞ্চম দিনে তারই কবলে পড়ে সম্প্রতি আরোগ্যলাভ করার পথে—তাই এতদিন চিঠি দিই নি। আজ অন্নগ্রহণ করলুম। তুই এখন কোথায়? কোডারমায় না কলকাতায়? দুদিন মাত্র সুযোগ পেয়েছিলাম কাশী দেখবার, তাতেই অনেকখানি দেখে নিয়েছি। কাশী ভাল লাগছে না: অনেকদিন পর ফিরে পাওয়া তামার পয়সার মতো ম্লান লাগছে। আর শরীর এখন খুবই দুর্বল, কারণ এ-কদিন সাংঘাতিক কষ্ট গেছে। তোকে রীতিমত কষ্ট করেই লিখতে হচ্ছে। আর লিখতে পারছি না। সকলের কুশলসহ এই চিঠির আশু বিস্তৃত জবাব চাই।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

২৮।১০।৪৪

পুনশ্চ:

হঠাৎ এখানে অন্নদার[৩৪] সঙ্গে দেখা হয়েছিল। খুব আনন্দ পেয়েছিলাম।

কুড়ি

S. B.
C/o Haradas Bhattacherjee
279 Agastya Kundu
Benares City
২০. ১১. ৪৪

অরুণ,

তোর চিঠি অনেকদিন হল পেয়েছি, পেয়ে তোকে হতাশই করলুম। অর্থাৎ উত্তর দিতে দেরিও করলুম অথচ কাশীর বর্ণনামূলক ব্যক্তিগতভাবে চিঠিটা লিখলুম না। লিখলুম না এইজন্যে যে, কাশীর একটানা নিন্দে করতে আর ইচ্ছে করছে না : ওটা মুখোমুখিই করব, তাই আপাতত স্থগিত রাখলুম।

শুনে বোধহয় দুঃখিত হবি যে, আমি আবার অসুখে পড়েছি। তবে এবারে বোধহয় অল্পের ওপর দিয়ে যাবে। তা ছাড়া যদি ভাল হয়ে উঠতে পারি, তা হলে আশা করা যায়, আগামী ২৯ তারিখে তোর সঙ্গে কলকাতায় আমার সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু বেলেঘাটায় ফিরে যেতে আশঙ্কা হচ্ছে। কেননা বেলেঘাটাই এখন ম্যালেরিয়া-সাম্রাজ্যের রাজধানী। আর আমি ম্যালেরিয়ার রোগী হয়ে কি সেখানে প্রবেশ করতে পারি? বিশেষত আমি যখন ম্যালেরিয়া সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতে আর রাজী নই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তুই চিরকেলে ম্যালেরিয়া রোগী; তুই কি করে এখনো টিকে আছিস? (অবিশ্যি এখনো কিনা – ঠিক বলতে পারছি না)।

কেবল ম্যালেরিয়ার কথাই বলে চলেছি, এখন কাশীর কথা কিছু বলি।

কাশীর আমি প্রায় সব দ্রষ্টব্যই দেখেছি। ভাল লেগেছে কেবল ইতিহাসখ্যাত চৈত সিংহের যুদ্ধঘটনাজড়িত প্রাসাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, আর রাজা মানসিংহ স্থাপিত Observatory মানমন্দির। অবিশ্যি বিখ্যাত বেণীমাধবের ধ্বজা থেকে কাশী শহর খুব সুন্দর দেখায়, কিন্তু সেটা বেণীমাধব বা কাশীর গুণ নয়, দূরত্বের গুণ। কাশীর

গঙ্গা এবং উপাসনার মতো স্তব্ধ তার শ্যামল পরপার, এ দুটোই উপভোগ্য। কাশী শহর হিসেবে খুব বড় সন্দেহ নেই; বিশেষত আজকের দিনে আলো-ঝলমল শহর হিসেবে! অর্থাৎ এখানে 'ব্ল্যাক-আউট' নেই। আর পথে পথে এখানে দেখা যায় লোকের ভিড় কলকাতার মতোই।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'ছাত্র-নিবাস-মূলক' বিশ্ববিদ্যালয়। আর দেখলাম গান্ধীজী পরিকল্পিত ভারতমাতার মন্দির। দুটোতেই ভাল লাগার অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও ধর্মের লেবেল আঁটা বলে বিশেষ ভাল লাগল না। আর সবচেয়ে ভাল লাগল সারনাথ। তার ঐতিহাসিকতায়, তার নির্জনতায়, তার স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে, তার ইটপাথরে খোদিত কর্মগাথায় সে মহিমময়। —সুকান্ত ভট্টাচার্য

এখন জ্বর আবার আসছে!

□

একুশ কলকাতা

অরুণ, ২০।১।৪৫

তোর খবর কি? এক মাস তোর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। অবিশ্যি দেখা-সাক্ষাৎ করাটা তোর কাছে অধুনা অবান্তর। আমি কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে বার দুই তিন বেলেঘাটায় গেছি তোর খোঁজে। যাই হোক, তোর খবরের জন্যে আমি কি রকম উৎসুখ তা 'রিপ্লাই কার্ড' দেখেই আশা করি আন্দাজ করতে পারবি, এর পর যেন আর উত্তর দিতে দেরি করিস নি। অসুখ করে নি তো? কেননা, আমি ইতিমধ্যে আবার অসুখে পড়েছিলাম। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য আমার দুশ্চিন্তা ও অবহেলার সীমা নেই, যদিচ তোড়-জোড় করছি খুব। তাই উত্তর দিতে অবহেলা করে আর দুশ্চিন্তা বাড়াস নি। কলকাতায় কবে ফিরবি? বাড়ির অন্য সব কে-কেমন আছে জানাস। —সুকান্ত

বাইশ **কলকাতা**

২. ২. ৪৫

অরুণ,

কাল-পরশু-তরশু, যেদিন হয় শৈলেনের কাছ থেকে সংস্কৃত নোটখানা নিয়ে বেলা পাঁচটার মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করিস। বেলেঘাটার হৃষীদা'দের[৩৫] কি বক্তব্য জেনে আসিস, আমি তার কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করব। দেখাটা ৪-৫ টার মধ্যে হলেই ভাল হয়। মনে রাখিস, অন্যথা অক্ষমনীয়।

□ —সুকান্ত

তেইশ

অরুণ,

কবিতা পাঠালুম। সেদিন[৩৬] লাঞ্ছনা কমই হয়েছিল। কেননা সে সন্ধ্যায় সহপাঠিনীও ফাঁকি দিয়ে আমার মুখরক্ষার সুবিধা করে দিয়েছিল। আমার সাম্প্রতিক মনোভাব শোচনীয়। অবস্থাটা কবিতায় বলি :

কেবল আঘাত দেয় মূর্খ চতুর্দিক,
তবুও এখনো আমি নিষ্ক্রিয় নির্ভীক,
ভারাক্রান্ত মন আজ অবিশ্রান্ত যায়,
তবু নিকটস্থ ফুল সুগন্ধে মাতায়।

—সু

□

চব্বিশ

২১।৯।৪৫

অরুণচন্দ্র।

কলকাতায় এত কাণ্ড, এত মিটিং অথচ তোর পাত্তা নেই, বাড়িতে এসে সেখানেও নেই, পাত্তাটা কোথায়?

সুভাষ আগামী বুধবার এখানে আসতে রাজী হয়েছে। তার জন্য আয়োজন করতে থাক। আমার তাড়া থাকায় আমি চললাম।

—সুকান্ত

২-৫৫ মিঃ দুপুর।

পঁচিশ

(ক)

৮ই, ডেকার্স লেন : 'স্বাধীনতা'

২৪. ৫. ৪৬

প্রিয় বয়স্য,

তোর আবেগের কারণটা ঠিক বুঝলাম না, কেমন যেন হেঁয়ালী। এই হেঁয়ালীকে ব্যঙ্গ করব, না সহানুভূতি জানাব তাও বুঝছি না। আমি খুলনা যাওয়ার সুযোগ হারিয়েছি এক মুহূর্তের লজ্জায়। কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী[৩৭] নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, আমি হঠাৎ 'না' বলে ফেলেছিলাম। যাই হোক, তুই তাড়াতাড়ি ফিরিস। তোর চিঠির থলি এখুনি ঘাড়ে করে বেরুব। 'কার্টুন' ভাল হলে পাঠাস। ভূপেনের লেখা মন্দ হয় নি। 'কবিতা' পত্রিকায় এবারও তোর আর আমার লেখা প্রকাশিত হয় নি। যেতে পারলুম না বলে দুঃখ করিস নি।

—সুকান্ত

(খ)

স্বামী অরুণাচল মহারাজ সমীপেষু,

বাবাজী!

আপনি গাঁজার ঘোরে ভুল দেখিয়াছেন। আপনার 'নাম-চিহ্ন' নকল করা হয় নাই। ছবিটি বিখ্যাত শিল্পী অহিনকুল মুখোপাধ্যায়ের[৩৮] আঁকা। নামচিহ্ন অনেকটা আপনার ন্যায় হইলেও স্বাতন্ত্র্য আছে। সুতরাং ডায়ালেক্‌টিকাল আদালতের[৩৯] কী ভয় দেখাইতেছেন! ব্যাপারটি মেটাফিজিকস[৪০] তাই বুঝিতে পারেন নাই[৪১]।

দুর্বিনীত : সুকান্ত শর্মা

"তোমার হলো শুরু : আমার হলো সারা"

২০, নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ দুপুর,
কলিকাতা

অরুণ,

তোর চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। ভেবেছিলাম খুব দুরবস্থার মধ্যে আছিস, চিঠি পেয়ে বুঝলাম, মা-র কোলে সুখেই দিনাতিপাত করছিস এবং মনের আহ্লাদে স্মৃতির জাবর কাটছিস সুতরাং আমি এখন নির্ভয়।

তোর তৃতীয় (!?) প্রেমের ইতিবৃত্ত পড়লাম, প'ড়ে খুশিই হলাম।—বরাবরই তোর এই নূতনত্বের প্রীতি আমাকে আনন্দ দিয়েছে। এবারও দিল। ভয় নেই তোর এই ব্যাপারে আমি তোকে নিরুৎসাহ করতে চাই না।

কারণ তোর মতো বঞ্চিত জীবনে এই রকম নায়িকার আবির্ভাব বারবার হওয়া দরকার। যদিও এ জাতীয় প্রেমোপাখ্যানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমি বরাবর অতি-সতর্কতার দরুন সন্দিহান, তবুও এর উপকারিতাকে আমি অস্বীকার করি না। তবে, এই ব্যাপারে উৎসাহ দিতে গিয়েও আমি তোকে একটা প্রশ্ন করছি—এইভাবে এগোলে জীবনের জটিলতা কি আরো বেড়ে যাবে না? অবশ্য ভাল' মন্দ বিবেচনার ভার তোর ওপর এবং পারিপার্শ্বিক বিচারও তুই-ই করবি, সুতরাং আমার এ বিষয়ে বলা অনর্থক।

চিঠির সমালোচনা করতে বলেছিস, কিন্তু সমালোচনা করার বিশেষ কিছুই নেই। ভাষা সংযত এবং পূর্বাপেক্ষা ভাল, চিঠিতে আবেগ কম, তথ্য বেশী এবং চিঠিটা বিরাট হয়েও বিরক্তিকর তো নয়ই বরং কৌতূহলোদ্দীপক। একমাত্র "উপলব্ধি" বানান ছাড়া আর সব বানানই শুদ্ধ। হাতের লেখা তেমন ভাল নয়।

বিষয়বস্তু : একটি মেয়ে। মেয়েটির নাম…? …হোক আর ছাই না-ই হোক, মেয়েটির যে অনেক গুণ আছে সে পরিচয় পেয়েছি,…কেমন জানতে পারি নি। অবশ্য সে যদি হয় তবে রূপ বর্ণনার প্রয়োজন নেই, কারণ সেটা অজ্ঞাত নয়। একটি মেয়ের প্রেম এই চিঠির বৈশিষ্ট্য, তাই এই চিঠি সরস এবং উত্তেজনাময়। মানুষ চিরকালই প্রেমের গল্প পড়তে ভালবাসে। সেই হিসাবে দেখলেও চিঠিটা Interesting. সবকিছু ছাড়িয়ে এই চিঠিতে ফুটে উঠেছে তোর ভবিষ্যৎ; যে ভবিষ্যৎ হয়তো সুখের অথবা বঞ্চনার হবে; যে ভবিষ্যৎ লাঞ্ছনার অথবা মুক্তির হবে। বন্ধু হিসাবে আমি তোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত। সমালোচক হিসাবে সন্দিগ্ধ। সুতরাং এ বিষয়ে আমার মতামতের কোনো দাম নেই। তোদের কবিতা "দ্বৈত" যেমন ছেলেমানুষিতে ভরা, তেমনি চমৎকার পন্থা পরস্পরের মন জানার। তোর আর্থিক সুরাহা যদি হয় তবে আমিই সর্বাপেক্ষা খুশী হব। নিঃস্বার্থ খুশী।

তোর শরীর খারাপ লিখেছিস অথচ ভাল হওয়ার ব্যাপারে "জিদবশত" সিদ্ধহস্ত, এই গর্বও প্রকাশ করেছিস। তাই আমি তোর শরীর খারাপের ব্যাপারে চিন্তিত, গর্বের ব্যাপারে মুচকি-হাসিত। আমি কেবল কামনা করছি মনেপ্রাণে সুস্থ হয়ে ওঠ; সত্যিকারের শিল্পী হয়ে ওঠ। তোর বিজয় ঘোষিত হোক।

আমার খবর: শরীর মন দুই-ই দুর্বল। অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে। হয়তো এইটাই মহত্তর সাহিত্য সৃষ্টির সময় (ভয় নেই, আঘাতটা প্রেমঘটিত নয়)। আজকাল চারিদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি। হাজার হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে ভবিষ্যৎ আকাশ। গত বছরের আগের বছর থেকে শরীর বিশেষভাবে স্বাস্থ্যহীন হবার পর আর বিশ্রাম পাই নি ভালমতো। একান্ত প্রয়োজনীয় বায়ু "পরিবর্তনও"

ঘটে নি আমার সময় ও অর্থের অভাবে। পার্টি আর পরীক্ষার জন্যে উঠে দাঁড়ানোর পর থেকেই খাটতে আরম্ভ করেছি; তাই ভেতরে অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছিল। পরীক্ষা দিয়ে উঠেই গত তিন মাস ধরে খাটছি। বুঝতে পারি নি স্বাস্থ্যের অযোগ্যতা। হঠাৎ গত সপ্তাহে হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতায় শয্যা নিলুম। একটু দাঁড়াতে পেরেই গত দেড় মাস ধরে·····জন্যে অবিরাম আন্তরিক খাটুনির পুরস্কার হিসাবে···কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেলুম যাতায়াতী খরচের জন্যে পাঁচটি টাকা। আর পেলুম চারদিনের জন্যে পার্টি হাসপাতালের "ওষুধপথ্যিহীন" কোমল শয্যা। এতবড় পরিহাসের সম্মুখীন জীবনে আর কখনো হইনি। আমার লেখকসত্তা অভিমান করতে চায়, কর্মীসত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে। দুই সত্তার দ্বন্দ্বে কর্মীসত্তাই জয়ী হতে চলেছে; কিন্তু কি করে ভুলি, দেহ আর মনে আমি দুর্বল: একান্ত অসহায় আমি? আমার প্রেম সম্পর্কে সম্প্রতি আমি উদাসীন। অর্থোপার্জন সম্পর্কেই কেবল আগ্রহশীল। কেবলই অনুভব করছি টাকার প্রয়োজন। শরীর ভাল করতে দরকার অর্থের, ঋণমুক্ত হতে দরকার অর্থের; একখানাও জামা নেই, সেজন্যও যে বস্তুর প্রয়োজন তা হচ্ছে অর্থ। সুতরাং অর্থের অভাবে কেবলই নিরর্থক মনে হচ্ছে জীবনটা।

আমাদের উপন্যাসটা চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল এবং সেজন্যে আমাদের তিনজনের অভিশাপ যদি কেউ পায় তো সে অরুণাচল বসুই পাবে। সে যদি জোর করে ত্রিভুজের মধ্যে মাথা না গলাতো তা হলে এমনটি হ'ত না। তোর বদলে···কে লিখতে দেওয়া হয়েছিল। সে বিশ্বাসঘাতকতা করল। তিন সপ্তাহ আগে তাকে খাতা দেওয়ার পর আজো সে কিছুই লেখে নি এবং বোধহয় খাতাও ফেরত দেয় নি ভূপেনকে। তোর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে সে আমায় পাগল করে রেখেছিল, দেখা হলে কৈফিয়ৎ দিল: আমার আশ্রয় নেই তাই লিখতে পারি নি, গৃহহীন আমি Advance অফিসেই রাত্তির কাটাই।

দেবব্রতের খবর রাখি না অনেকদিন হল। তুই যে ঝি দিতে চাস্ তা আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। বাবা-দাদা উভয়েই আগ্রহ দেখিয়েছে। যদি "তার" পাথেয় একান্তই যোগাড় না হয় তা হলে আমাকে লিখিস, পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

—সুকান্ত
৩১শে জ্যৈষ্ঠ ৫৩।

□

সাতাশ

10 Rawdon Street
Calcutta.

বন্ধুবৎসলেষু[৪২]

.....

.....

২৭।৬।৪৬ —সুকান্ত

□

আঠাশ

৩।৭।৪৬

অরুণ,

তুই কবে আসছিস? আমার চতুর্দিকে দুর্ভাগ্যের ঝড়। এ-সময় তোর উপস্থিতি আমার পক্ষে নির্ভরযোগ্য হবে। তোর খবর ভাল তো?

আমাদের ঝি চলে গেছে। আসার সময় তুই যে ঝি দিবি বলেছিলি, তাকে আনা চাই-ই। আমার ১৩৫২-র বৈশাখের 'পরিচয়'-খানাও আনিস। আর সবার খবর ভাল। মা-র খবর কী?

—সুকান্ত

উনত্রিশ

বুধবার, সকাল ১১টা

অরুণ,

তোকে কাল যে ওষুধটা পাঠিয়েছি ভাত খাওয়ার পর দু'চামচ করে খাচ্ছিস তো? ওটা তোর পক্ষে অমোঘ ওষুধ। দিন-তিনেকের মধ্যেই জ্বর বন্ধ হয়ে যাবে, আশা করছি।

তোর কথামতো তোর জন্যে দুখানা টিকিট এনে ফেলেছি। তা ছাড়া আরো দুটো টিকিট এনেছি···তোর ভক্তদের কাছে বিক্রি করার জন্যে। টিকিট চারটে পাঠালাম (দাম প্রতিটি এক টাকা)। ডাক্তার আমাকে শয্যাগত করে রেখেছে, কাজেই তুই একমাত্র ভরসা। যেমন করে হোক, টিকিট চারটে বিক্রি করে শনিবারের মধ্যে দামগুলো আমার বাড়িতে পৌঁছে দিবি। এটা হুকুম নয়, অনুরোধ।

তা ছাড়া শনিবার তোর বাড়িতে 'চতুর্ভুজ' বৈঠকের কথা ছিল। সেটা আমার বাড়িতেই করতে হবে। আমি নিরুপায়। ভূপেনকে সেই অনুরোধ জানিয়েই আজ চিঠি দেব। আশা করছি, তুই আমার অবস্থাটা বুঝবি।[৪৩]

—সুকান্ত

□

ত্রিশ

অরুণ,

সন্ধ্যে সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে যে-করে হোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বাড়িতে আসিস। এই রকম জরুরী দরকার খুব কম হয়েছে এ পর্যন্ত। মনে রাখিস;

অত্যন্ত জরুরী[৪৪]

—সুকান্ত

একত্রিশ

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭

সকাল

অরুণ,

আমি পরশু শ্যামবাজার যাচ্ছি। কাজেই দু-একটা কাজের ভার তোকে দিচ্ছি, আগামীকাল রাত্তিরের মধ্যে কাজগুলো করে তুই আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই কাল দেখা করবি কাজগুলো হচ্ছে

(১) শিশির চ্যাটার্জির[৪৫] কাছ থেকে 'খবর' ইত্যাদি কবিতা-গুলো জোর করে আনবি।

(২) দেবব্রতবাবুর[৪৬] কাছ থেকে আমার ছড়ার বইয়ের পাণ্ডুলিপি যে-করে হোক সংগ্রহ করা চাই।

(৩) যে জিনিসটার জন্যে তোকে নিত্য তাগাদা দিচ্ছি, পারিস তো সেটাও আনিস।

কাজগুলো খুবই জরুরী। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওপরের তিনদফা জিনিসগুলো হস্তগত করে আমার সঙ্গে দেখা করবি। অনেক সুখবর আছে।

—সুকান্ত

□

বত্রিশ

যাদবপুর টি-বি হাসপাতাল

অরুণ।

সাতদিন হয়ে গেল এখানে এসেছি। বড় একা-একা ঠেকছে এখানে। সারাদিন চুপচাপ কাটাতে হয়। বিকেলে কেউ এলে আনন্দে অধীর হয়ে পড়ি। মেজদা[৪৭] নিয়মিত আসে, কিন্তু সুভাষ নিয়মিত আসে না। কাল মেজবৌদি-মাসিমাকে[৪৮] নিয়ে মেজদা এসেছিল। চলে যাবার পর মন বড় খারাপ হয়ে গেল। বাস্তবিক শ্যামবাজারের ঐ পরিবেশ ছেড়ে এসে রীতিমত কষ্ট পাচ্ছি।

তুই কি এখনো দাঙ্গার অবরোধের মধ্যে আছিস? না কলকাতায়

যাতায়াত করতে পারছিস? যাই হোক, সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে দেখা করবি। দেখা করবার সময়—বিকাল চারটে থেকে ছ'টা। শিয়ালদা দিয়ে ট্রেনে করে আসতে পারিস, কিম্বা ৮এ বাসে। এখানে 'লেডী মেরী হার্বাট ব্লক' এক নম্বর বেডে আছি। আশা করি আমার চিঠি পাবি। দেখা করতে দেরি হলে চিঠি দিস।[৪৯]

৮।৪।১৯৪৭ —সুকান্ত

□

তেত্রিশ

শ্রদ্ধাস্পদাসু,[৫০]

মা, আপনার ছোট্ট মৌচাকটি আমার হস্তগত হল। কিন্তু কৃপণতার জন্য দুঃখ পেলাম।

আপনি আমায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন। আপনার আগ্রহ আমায় লজ্জা দিচ্ছে তাড়াতাড়ি যেতে পারছি না বলে। আপনার আগ্রহ উপেক্ষা করতে পারব বলে মনে হয় না। আমার মুর্শিদাবাদ যাবার ইচ্ছে নেই। তবে ঝাঁঝায় যাবার কথা হচ্ছে দাদা-বৌদির—সেখানে যেতে পারি। তবে আপনাদের ওখানকার আমন্ত্রণ সেরে।

সেদিন আপনাদের ট্রেইনখানা আমার সামনে দিয়ে গেল, পিছন থেকে অমূল্যবাবুকে দেখেছিলাম, আর দেখেছিলাম আপনার কয়েকজন সহযাত্রীকে, কিন্তু আপনাকে দেখলাম না দুঃখের বিষয়। ...কিছুদিন মনে হ'ত, আজ সন্ধ্যায় কোথাও যেতে হবে না! আজকাল সে-ভাব থেকে মুক্ত। আপনারা নিশ্চয়ই ভাল আছেন? আপনি আমার,—থাক কিছুই জানাব না।

...এমন একজন যে আপনার বাবা হতে পারবে না; কারণ, তার বড় ভয়, পাছে সে বাবা হলে বাবার কর্তব্য হতে বিচ্যুত হয়।

আর আপনার 'অরুণ-বাবা'টি তো মেয়ের আবদারে নাকি কলের পুতুল ব'নে আছে। সুতরাং উল্টোটাই হোক। আপনার কৃপণতার প্রতিশোধ নিলুম, ছোট চিঠি দিয়ে। ইতি—

— সুকান্ত

□

চৌত্রিশ

শ্রদ্ধাস্পদাসু,[৫১]

বিস্তারিত বর্ণনা আগামী পত্রে প্রাপ্তব্য। আপনি এবং আপনার পুত্র আশা করি কুশলময়। অরুণকে বলবেন আমার চিঠির জবাব দিতে, তার ব্যাপার দুঃখপ্রদ। আমরা কুশলে। ইতি

—সুকান্ত

□

পঁয়ত্রিশ

কলকাতা

শ্রদ্ধাস্পদাসু,[৫২]

মা, প্রথমেই আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখা ভাল। কারণ অপরাধ আমার অসাধারণ—বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আপনার স্বপক্ষে। আর আমার প্রতিবাদ করবার কিছুই যখন নেই, তখন এই উক্তি আপনার কাছে মেলে ধরছি যে, পারিবারিক প্রতিকূলতা আমাকে এখানে আবদ্ধ করে রেখেছে ; নইলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমার অপরাধ যে হয়েছে, সেটা অনস্বীকার্য। তবু উপায় যখন নেই, তখন ক্ষমা ভিক্ষা করা ছাড়া আর আমার গতি রইল না। বাড়ির কেউ আমায় এই দুর্দিনে চোখের আড়াল করতে চায় না। অথচ এখানটাও যে নিরাপদ নয়,

সেটা ওরা বুঝতে পারে এবং পেরেও বলে, মরতে হলে সবাই একসঙ্গে মরব। কী যুক্তি? আসল ব্যাপার হচ্ছে সমূলে বিনাশ হলেও আমি যেন না এই সংসার-বৃক্ষচ্যুত হই।

…যেখানে যাই সেখানেই দেখি কুশ্রীতা মলিনতা—এক দুর্নিবার গ্লানিতে আমি ডুবে আছি। আপনাকে এত কথা বলছি এর কারণ আপনার কাছে সান্ত্বনা, আশ্বাস চাই বলে; আপনার আশীর্বাদ চাই যাতে এই দূষিত আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারি। আজকাল আপনাকে খুব বেশী করে—ঠিক এই সময়ে আপনার পবিত্র সান্নিধ্য পেলে আমি নিজেকে এতটা অসহায় মনে করতুম না – এই কথা ভেবে মনে পড়ে। চিঠি লেখার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই।

বাস্তবিক, আমি কোথাও চলে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে মিলিয়ে যেতে চাই…কোনো গহন অরণ্যে কিংবা অন্য যে কোন নিভৃততম প্রদেশে; যেখানে কোনো মানুষ নেই, আছে কেবল সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট-মনা হিংস্র আর নিরীহ জীবেরা, আর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। এতোরও দরকার নেই, নিদেনপক্ষে আপনাদের ওখানে যেতে পারলেও গভীর আনন্দ পেতাম, নিষ্কৃতির বন্য আনন্দ; সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার নিবিড় অসহযোগ চলছে। এই পার্থিব কৌটিল্য আমার মনে এমন বিস্বাদনা এনে দিয়েছে, যাতে আমার প্রলোভন নেই জীবনের ওপর।…এক অননুভূত অবসাদ আমায় আচ্ছন্ন করেছে। সমস্ত পৃথিবীর ওপর রুক্ষতায় ভরা বৈরাগ্য এসেছে বটে, কিন্তু ধর্মভাব জাগে নি। আমার রচনাশক্তি পর্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে মনের এই শোচনীয় দুরবস্থায়। প্রত্যেককে ক্ষমা করে যাওয়া ছাড়া আজ আর আমার অন্য উপায় নেই। আচ্ছা, এই মনোভাব কি সবার মধ্যেই আসে এক বিশিষ্ট সময়ে?

যাক আর বাজে বকে আপনাকে কষ্ট দেব না। আমার আবার মনে ছিল না, আপনি অসুস্থ! আপনার ছেলে কি পাবনায় গেছে? তাকে একটা চিঠি দিলাম। সে যদি না গিয়ে থাকে, তবে

সেখানা দেবেন এই বলে যে, 'এ-খানাই তোমার প্রতি সুকান্তর শেষ চিঠি।'—আচ্ছা কিছুদিন আগে একখানা চিঠি (Post card) এসেছিল। চিঠিখানার ঠিকানার জায়গায় কাগজ মেরে দেওয়া হয়েছিল আর তার ওপর ঠিকানা লেখা ছিল। সেই চিঠিখানা বেয়ারিং হয়। সেখানা কি আপনাদের কারুর চিঠি? বেয়ারিং করার মূর্খতার জন্য চিঠিটা আমি না দেখে ফিরিয়ে-দিয়েছিলাম; তবে সেখানা আপনাদের হলে অনুতাপের বিষয়। আমার আপনাদের ওখানে যাবার ইচ্ছা আছে সর্বক্ষণ, তবে সুযোগ পাওয়াই দুষ্কর। আর সুযোগ পেলেই আমায় দেখতে পাবেন আপনার সমক্ষে। চিঠির উত্তর দিলে খুশী হব। না দিলে দুঃখিত হব না। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। এখানকার আর সবাই ভাল। ইতি। শ্রদ্ধাবনত—

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সর্বাগ্রে আপনার ও অপরের কুশল প্রার্থনীয়।—সুঃ ভঃ

□

ছত্রিশ

দোল-পূর্ণিমা
কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদাসু,[৫৩]

মা, আপনার পত্রাংশ ঠিক সময়েই পেয়েছিলাম। উত্তর দিতে দেরি হল। কারণ, সেই সময়ে আমি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম।...আর দিনরাত পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। এখন ওষুধ খেয়ে অনেকটা ভাল আছি।

শীগ্‌গিরই যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি হব। আপনি কেমন আছেন? অরুণ আমার কাছে মোটেই আসে না।

স্নেহাধীন
সুকান্ত

সাঁইত্রিশ

১১ডি, রামধন মিত্র লেন
পোঃ শ্যামবাজার
কলিকাতা-৪

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

মা, আপনার চিঠি কয়েকদিন হল পেয়েছি। চিঠিতে বসন্তের এক ঝলক আভাস পেলাম। আপনার কথামত পাতাটা সঙ্গে-সঙ্গেই রেখেছি, তবে বেটে-খাওয়া সম্ভব হল না। আবার আমার পেটের অসুখ ও পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। তবে আজ একটু ভাল আছি।

দিন সাতেকের মধ্যেই হাসপাতালে যাব। সেখান থেকে পরে যাব আজমীর। অরুণ মধ্যে দিন-দুই এসেছিল। আপনার খবর কী ?

২০।৩।৪৭ —সুকান্ত

□

আটত্রিশ

বেলেঘাটা
১।২।৪৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু—[৫৪]

আপনার এখান থেকে চলে যাবার দিন কথা দেওয়া সত্ত্বেও কেন আপনার অফিসে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করি নি তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ এই চিঠি উপস্থিত করলাম। সেদিন রাত ৮-৩০ এমনি সময় যথাস্থানে গিয়ে শুনলাম আপনি চলে গেছেন। সুতরাং দুঃখিত মনে বাড়ি ফিরেছিলাম। তারপর কর্তব্যবোধে এই চিঠি লিখলাম। অরুণকে এবং মাকে নিশ্চয়ই আমার না-যাবার নিরুপায়তা সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝিয়েছেন। আর আমি চেষ্টা করছি যথাসত্বর আপনাদের সামনে উপনীত হতে। কিন্তু এরা আমাকে যেতে দিতে রাজী তো নয়ই, যাবার বিপক্ষে নানান অবান্তর ও হাস্যকর যুক্তি দর্শাচ্ছে ; তবু চেষ্টা চালাচ্ছি। দরকার হলে পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হব। অরুণ এবং মা উভয়কে জানাবেন তাঁদের অবিলম্বে পত্র দেব। আপনার অবস্থিতিতে আশা করি সব অমঙ্গল দূরীভূত হয়েছে। আপনাদের কুশল কাম্য। বিনীত—

সুকান্ত

উনচল্লিশ

বেলেঘাটা
১৬ই এপ্রিল
[১৯৩৯ ?]

ভূপেন,[৫৫]

একটা চিঠি লিখছি। অত্যন্ত অনিচ্ছায় কিংবা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে না হলেও খুব মন দিয়ে লিখছি না। একটা সুযোগের প্রলোভনে চিঠিটা লিখতে বাধ্য হলুম ; কেন জানি না। তোমাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে তাকে দমন করতে পারি না। তবুও লিখে তৃপ্তি পায় না মন আর লোভও বেড়ে যায়। এই তো চিঠি লিখলাম। আবার একটু পরে হয়তো তোমায় দেখতে ইচ্ছা করবে। আগুনের মধ্যে পতঙ্গ হয়তো ঝাঁপ দিতে চাইবে ; চঞ্চল মনের অঞ্চল হয়তো বসন্তের বাতাসে একটু দুলতে চাইবে ; মনের মাদকতা হয়তো একটু বাড়বে কিন্তু শীর্ণ শাখায় সে দোলা সুখের দিনগুলিকে ঝরিয়ে দেবে। আজকাল মাঝে মাঝে অব্যক্ত স্পৃহা সরীসৃপের মতো সমস্ত গা বেয়ে সুস্থ মনকে আক্রান্ত করতে চায়। আমি এ সমস্ত সহ্য করতে পারি না। আমার চারিদিকের বিষাক্ত নিঃশ্বাসগুলো আমাকেই দগ্ধ করতে ছুটে আসে আর তার সে রোমাঞ্চকর নিঃশ্বাস আমাকে লুব্ধ করে।

আশার চিতায় আমার মৃত্যুর দিন সন্নিকট। তাই চাই আজ আমার নির্বাসন। তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই, তোমাদের ভুলতে চাই ; দীন হয়ে বাঁচতে চাই। তাই সুখের দিনগুলোকে ভুলে, তোমাদের কাছে শেখা মারণ-মন্ত্রকে ভুলে, ধ্বংসের প্রতীক স্বপ্নকে ভুলে মৃত্যুমুখী আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু পারব না, তা আমি পারব না ;—আমার ধ্বংস—অনিবার্য। আজ বুঝেছি কেন এত লোক দুঃখ পায়, সঠিক পথে চলতে পারে না। আলেয়া-যৌবন তার দিক্-ভ্রান্তি ঘটায়। হঠাৎ স্বপ্নাকাশে বাস্তবের মেঘগুলো জড়ো হয়ে দাঁড়ায় ভিড় করে, হাতে থাকে বুভুক্ষার শাণিত-খড়্গ আর অক্ষমতার হাঁড়ি-কাঠে তাদের মাথা কাটা পড়ে। এই তো জীবন। প্রথম যৌবনের

অলস অসতর্ক মুহূর্তে আমরাই আমাদের শ্মশানের চিতা সাজাই হাস্যমুখর দিনের পরিবেশনে। অশিক্ষিত আমাদের দেশে যৌবনে দুর্ভিক্ষ আসবেই। আর তারই বহ্নিময় ক্ষুধা আমাদের মনকে তিক্ত, অতৃপ্ত, বিকৃত করে তোলে। জীবনে আসে অনিত্যতা, জীবনীশক্তি যায় ফুরিয়ে, কাজে আসে অবহেলা, ফাঁকি আমরা তখনই দিতে শিখি আর তখনই আসে জীবনকে ছেড়ে চুপি চুপি সরে পড়বার দুরন্ত দুরভিসন্ধি।

আমার কর্মশক্তিও যাত্রার প্রারম্ভেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ছে এই ধূলিধূসরিত কুয়াশাচ্ছন্ন পথেই। অবসাদের শূন্যতা জানিয়ে দেয় পথ অনেক কিন্তু পেট্রোল নেই। তোমরা দিতে পার এই পেট্রোলের সন্ধান? বহুদিন অব্যবহৃত স্টীয়ারিংএ মরচে পড়ে গেছে, সে আর নড়তে চায় না, ঠিক পথে চালায় না—আমাকে। তোমরা মুছিয়ে দিতে পার সেই মলিনতা, ঘুচিয়ে দিতে পার তার অক্ষমতা?

যাক্, আগের চিঠির উত্তর দাও নি কেন? পায়ে পড়ে মিনতি জানাই নি বলে, না আমার মতো অভাজনের এ আশাতিরিক্ত বলে? রবীনের চিঠির সঙ্গে চিঠি দিলাম তারই খরচায়। আমার চিঠির উত্তর না দাও রবীনেরটা দিও। আমাদের Examination ২৮শে এপ্রিল। প্রাইজ ১৯শে; সেদিন আসতে পার। খোকনকে[৫৬] আমায় চিঠি দিতে ব'লো। ঘেলুর খবর কী? ইতি

সুকান্ত

□

চল্লিশ

রেড-এড কিওর হোম

১২. ৯. ৪৬

ভূপেন,

…এবার আমার কথা বলি। তিন সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভুগছি।

গত এক সপ্তাহ ধরে পার্টির হাসপাতালে কাটাচ্ছি—আরো কতদিন কাটাতে হবে কে জানে। যদিও অঞ্চলটা পার্ক-সার্কাস তবুও দাঙ্গা সংক্রান্ত ভয় নেই।

একরকম বৈচিত্র্যহীন ভাবেই দিন কাটছে, যদিও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। অনন্ত সিং গণেশ ঘোষ ছাড়া পেয়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন—সেই একটা বৈচিত্র্য। সেদিন ডাইনিং রুমে খাচ্ছি এমন সময় কমরেড জোশী সেই ঘরে ঢুকে আমাদের খাওয়া পরীক্ষা করলেন। এটাকেও বৈচিত্র্য বলা যেতে পারে।

তবে কাল আমার জীবনে সব থেকে স্মরণীয় দিন গেছে। মুক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বাদে) সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তাঁরা আমাদের কাছে এলেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর একজন বিপ্লবী তাঁর গলার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন আমায়। গণেশ ঘোষ বললেন—'আমি আপনাকে ভীষণভাবে চিনি।' অম্বিকা চক্রবর্তী ও অন্যান্য বন্দীরা সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন—আমি তো আনন্দে মুহ্যমান প্রায়। সত্যি কথা বলতে কি এতখানি গর্বিত কোনো দিনই নিজেকে মনে করি নি। ফ্রান্সে আর আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যেদিন শুনলাম সেদিনও এত সার্থক মনে হয় নি আমার এই রোগজীর্ণ অশিক্ষিত জীবনকে। কাল সন্ধ্যার একটি ঘণ্টা পরিপূর্ণতায় উপচে পড়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বরের এই সন্ধ্যা আমার কাছে অবিস্মরণীয়।

হাসপাতালের ছককাটা দিন ধীর মন্থর গতিতে কেটে যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে সকালের ঝক্‌মকে রোদ্দুরকে দুপুরে দেবদারু গাছের পাতায় খেলা করতে দেখি। ঝিরঝির ক'রে হাওয়া বয় সারাদিন। রাত্তিরে চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়, ডালহাউসী স্কোয়ারের অপিসে বসে কোনো দিনই অনুভব করতে পারবি না এই আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। এখন দুপুর—কিন্তু চারিদিকে এখন রাত্রির

নৈঃশব্দ্য : শুধু মাঝে মাঝে মোরগের ডাক স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, এটা রাত্রি নয়– দিন।

রেডিও, বই, খেলাধুলো—সময় কাটানোর অনেক উপকরণই আছে, আমার কিন্তু সবচেয়ে দেবদারু গাছে রোদের ঝিকিমিকিই ভাল লাগছে। উড়ে যাওয়া বাইরের খণ্ড খণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে বাতাসকে মনে হয় খুবই উপভোগ্য। এমনি চুপ ক'রে বোধহয় অনেক যুগ অনেক শতাব্দী কাটিয়ে দেওয়া যায়।

যাক্ আর নয়। অসুস্থ শরীরের চিঠিতে আমার ভয়ঙ্কর উচ্ছ্বাস এসে পড়ে, কিছু মনে করিস নি।

মেজদার মুখে শুনলাম—তুই নাকি প্রায়ই "স্বাধীনতা" কিনে পড়ছিস? শুনে খুব আনন্দ হল। নিয়মিত "স্বাধীনতা" রাখলে আরো খুশী হবো···

—সুকান্ত

□

একচল্লিশ

Red-aid Cure Home
10 Rawdon Street
Park Street P. O.
Calcutta-16

৩।১০।৪৬

ভূপেন,

দারোয়ানজীকে ধন্যবাদ—ধন্যবাদ পোস্ট অফিসের কর্তৃপক্ষ আর পিওনকে। তোর ১লা তারিখের চিঠি আজ ৩রা তারিখে পেলাম।

কলকাতা কি স্বাভাবিক হচ্ছে?

অসুখের মধ্যে চিঠি পেতে ও চিঠি লিখতে ভালই লাগে। যদিও আমার এখন একশ'র ওপর জ্বর তবুও বেশ উপভোগ্য লাগছে এই শুয়ে শুয়ে চিঠি লেখা।

Red-aid cure home
10 Rawdon Street
Park Street P.O.
Calcutta 16.

৩/১০/৪৬

দুলেন,

দাদাবাবুকে ধন্যবাদ — ধন্যবাদ
পেয়ে সন্তোষের কর্তৃপক্ষ আর পিয়নকে, তোর
১লা তারিখের চিঠি আজ ৩রা তারিখে পেলাম,
কলকাতা কী স্বাভাবিক হচ্ছে?

সম্মুখের মধ্যে চিঠি পেতে এবং চিঠি লিখতে
ভালোই লাগে। যদিও আমার এখন একটার
উপর ক্ষুব্ধ তবুও তোর উপভোগ্য লাগবে এই
ভেবে ভেবে চিঠি লেখা।

তুই যে আমার সঙ্গে দেখা করতে
আসিস নি এতে আমি খুশিই হয়েছি। আমি
যখন তোকে চিঠিটা লিখেছি তখনো কলকাতার
অবস্থা এতো সাংঘাতিক হয়নি, মন্বন্তরের কারণও
সৃষ্টি হয়ে যায় নি, অর্থাৎ অতর্কিতে।

আমি তোকে ডেকেছিলাম শুধুমাত্র তোর
সাহায্য পেতে নয়, সম্মুখে চট্টগ্রাম যুদ্ধের
পূর্ব্বের বীর কালী চক্রবর্তীদের সাথে তোর
আলাপ করিয়ে দেবো। শিশুর মতো সরল ঐ লোকটির
সঙ্গে পরিচয় তোর পক্ষে আনন্দের হবে।
আমার সঙ্গে তো ঐ ভীতিমতো বন্ধুত্বই হয়ে
গেছে। পার্থক্য, ঈশ্বর বীরদের প্রায়
সকলকেই শিশুর মতো হাসিখুশি, সরল, আনন্দ
প্রিয়। এছাড়াও বিখ্যাত অনিল গুহ এবং [illegible]
[illegible] এখানে এমন সুস্থ আবহাওয়া
জন্যে হয়েছেন, তাঁদের সাথেও তোর আলাপ
করিয়ে দেবার লোভ আমার ছিলো।
যাই হোক, কলকাতা মুক্ত না হলে আর
তোর দেখা পেতে পাই না। ইতিমধ্যে হয়
আমাদেরই একদিন [illegible] ছাড়া পাবার
পর তাদের এখানে নিয়ে হাজির হবো।
কিছুই বলা যায় না।

তুই যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসিস নি এতে আমি খুশীই হয়েছি। আমি যখন তোকে চিঠিটা পাঠাই তখনো কলকাতার অবস্থা এত সাংঘাতিক হয় নি; খবরের কাগজও বন্ধ হয়ে যায় নি এমন অতর্কিতে।

আমি তোকে ডেকেছিলাম শুধুমাত্র তোর সান্নিধ্য পেতে নয় সদ্যমুক্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর কালী চক্রবর্তীর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। শিশুর মতো সরল ঐ লোকটির সঙ্গে পরিচয় তোর পক্ষে আনন্দের হ'ত। আমার সঙ্গে তো এঁর রীতিমত বন্ধুত্বই হয়ে গেছে। বাস্তবিক এইসব বীরদের প্রায় প্রত্যেকেই শিশুর মতো হাসি-খুশি, সরল, আমোদপ্রিয়। এ ছাড়াও বিখ্যাত শ্রমিক এবং কৃষক নেতারা এখানে এখন অসুস্থ অবস্থায় জড়ো হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও তোর আলাপ করিয়ে দেবার লোভ আমার ছিল। যাই হোক, কলকাতা সুস্থ না হলে আর তোর দেখা পেতে চাই না। ইতিমধ্যে হয়তো আমিই হঠাৎ একদিন ছাড়া পাবার পর তোদের ওখানে গিয়ে হাজির হব। কিছুই বলা যায় না।

বেশ কাটছে এখানে। সবাই এখানে আপন হয়ে উঠছে, ভালবাসতে আরম্ভ করেছে আমাকে। ডাক্তার রোগী সবারই আনন্দ আমার সঙ্গে রসিকতায়। এক এক সময় মনে হয় বেশ আছি— শহরের রক্তাক্ত কোলাহলের বাইরে এই নির্জন, শ্যামল ছোট্ট একটু দ্বীপের মতো জায়গায় বেশ আছি। কিন্তু তবুও আমার শিকড় গজিয়ে উঠতে পারে নি, বাইরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ-সমৃদ্ধ হাতছানি সকাল সন্ধ্যায় ঝলক দিয়ে ওঠে তলোয়ারের মতো। এখন আছি বদ্ধ-দীঘির জগতে; সেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে মাছের মতো, কর্মচাঞ্চল্যময় পৃথিবীর স্রোতে। সকালের আশ্চর্য অদ্ভুত রোদ্দুর কোনো কোনো দিন সারাদিন ধরে কেবলই মন্ত্রণা দেয় বেরিয়ে পড়তে; শহর-বন্দর ছাড়িয়ে অনেক দূরের গ্রামাঞ্চলের সবুজে মুখ লুকোতে দেয় অযাচিত পরামর্শ। সত্যিই অসহ্য লাগে কলকাতাকে মনের এইসব মুহূর্তে।

উপন্যাসের ব্যাপারে তোর দুঃসাহসিক ধৈর্য আমাকে সত্যিই অনুপ্রাণিত করল।

পূজোয় কোথায় কোথায় লিখেছি জানতে চেয়েছিস? একমাত্র পূজোসংখ্যার 'স্বাধীনতা' ও 'পরিচয়' এবং কিশোরদের বার্ষিকী 'শতাব্দীর লেখা'য় লেখা বেরিয়েছে জানি। তা ছাড়া এইসব কাগজ ও সংকলনে লেখা বেরুনোর কথা আছে: (১) শারদীয়া বসুমতী (২) শারদীয়া আজকাল (৩) উজ্জয়িনী—সংকলন (৪) মেঘনা—সংকলন (৫) ক্রান্তি—সংকলন (৬) বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত একটি সংকলন ও (৭) পূজোর 'রংমশাল'।

তুই কেমন আছিস কোনো চিঠিতেই তা জানাস না, তাই আর ও প্রশ্নটা করলুম না। তোদের এবারে পূজো কি রকম জমলো লিখিস। খোকন[৫৬] এ রকম চুপচাপ কেন? আমার মামার পদ থেকে তো তাকে পদচ্যুত করা হয় নি। বিজয়ার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাসহ।

—সুকান্ত

□

বিয়াল্লিশ

রবিবার
সকাল ন'টা
[৪. ১১. ৪৬]

ভূপেন,

সেদিন যেমন কারো প্রভাবে বা ইঙ্গিতে প্ররোচিত না হয়েই নিজের বিবেকবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে তোকে রাগিয়ে দিয়ে চলে এসেছিলাম, আজো তেমনি বিবেকের পীড়নে এখন বাড়িতে বসে রয়েছি যখন খোকনের ওখানে যাবার কথা।

ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও ক'দিন ধরে খুব ঘোরাফেরা করেছি এখানে ওখানে, যার ফলে কাল রাত্তিরে অনেক দিন পরে জ্বর এল। তাই আমাকে এখন সাবধান হতে হবে। ডাক্তারের কথামত পরিপূর্ণ

বিশ্রামই আমার দরকার। তাই আবার বন্ধ করে দিলুম সুস্থ লোকের মতো ঘোরাফেরা।

আশা করছি, দু'ব্যাপারেই তুই আমাকে নির্দোষ মনে করবি।

—সুকান্ত

□

তেতাল্লিশ

Calcutta-11

৪।১২।৪৬

ভূপেন,

আমার রোগ এমন একটা বিশেষ সন্দেহজনক অবস্থায় পৌঁছেচে, যা শুনলে তুই আবার 'চোখে বিশেষ এক ধরনের ফুল' দেখতে পারিস। ডাক্তারের নির্দেশে সম্পূর্ণ শয্যাগত আছি। কাজেই আগামী 'চতুর্ভুজ বৈঠক' আমার বাড়িতে বসবে, অরুণের বাড়িতে নয়। আমি সেইমতো ব্যবস্থা করেছি। তুই শনিবার সোজা আমার বাড়িতেই আসবি।

আর একটা কথা : আমি খোকনকে চিঠি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম রোগের ঝামেলায় ; তুই দিয়েছিস তো ?

—সুকান্ত

□

চুয়াল্লিশ

কলকাতা
এবারকার বসন্তের প্রথম দিন
মঙ্গলবার ১৩৫১

মেজ বৌদি,

চিঠিখানা পেয়েই মেজদা ও নতেদাকে যা যা কহতব্য ছিল বলেছি। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমাকে হাসতে হয়েছে—সেটা

কাশী থেকে ফেরার জন্যে সংকোচ দেখে। আমার আর নতেদার নির্জনতা-প্রীতির গঙ্গাজল কখনো অপবিত্র হতে পারে না। আর, আমরা নির্জনতাপ্রিয় একথা সম্পূর্ণ মিথ্যে। সাময়িকভাবে নির্জনতা ভাল লাগলে যে চিরকালই ভাল লাগবে এমন কথা আমরা বলি না। নতেদা যে নির্জনতাপ্রিয় নয়, অধুনা নতেদার প্রাত্যহিক সান্ধ্য-বৈঠক-গুলোই তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। আর আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হব, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তা ছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই। সুতরাং সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান। সংকোচ কাটিয়ে ওঠার জন্যে নেমন্তন্নের লাল চিঠি পাঠিয়ে দিলাম।

আমার কিছু নেবার আছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছি আমি একটি পোড়ামুখ বাঁদর চাই। কেননা ঐ জিনিসটার প্রাচুর্য কাশীতে এখনো যথেষ্ট। তা ছাড়া, স্মৃতি হিসাবে জীবন্ত থাকবে। আর আমার সঙ্গেও মিলবে ভাল।

এদিকে মেজদার চেষ্টায় বাড়ি বদল হচ্ছে। এই পরিবর্তন খুব সময়োপযোগী হয় নি, এইটুকু বলতে পারি। আশা করি শ্বেত-স্নাত নতুন বাড়ি প্রত্যেকের কাছেই ভাল লাগবে।

শুনলাম আসন্ন বিচ্ছেদের ভয়ে কাশীস্থ সবাই নাকি ম্রিয়মান? হওয়া অনুচিত নয় এইটুকু বেশ বুঝতে পারি।

আজকাল ভালই আছি বলা উচিত, কিন্তু একেবারে ভাল থাকা আমাকে মানায় না। তাই ঘাড়ের ওপর উদ্গত একটা বিষফোড়ায় কষ্ট পাচ্ছি। পড়াশুনায় হঠাৎ কয়েক দিন হল ভয়ানক ফাঁকি দিতে শুরু করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাঁকিবাজ হিসাবে নাম ক্রয় করেছি। পড়াশুনা করে না হোক না করে যে ফার্স্ট হয়েছি এইটাই আমার গর্বের বিষয় হয়েছে।

অস্তি বারাণসী নগরে সব ভাল তো? এখানকার সবাই, বিশেষ করে মেজদা ডবল মামলার মামলেট খাওয়া সত্ত্বেও শরীরে ও মেজাজে

কলিকাতা
এবারকার রোদ্দুরে প্রথম
মঙ্গলবার, ১

বেণুবৌদি,

চিঠিখানা পেয়েই বেণুদাও রতোদাকে খবর [illegible] দিয়েছিলাম বলেছি। কিন্তু একটা ট্রেনারের [illegible] হয়তে হবেছে [illegible] কাশী থেকে ফেরার জন্যে সংকোচ [illegible] দেখে। আমার আর রতোদার বিদায়-প্রীতির [illegible] কখনো [illegible] হতে পারে না। আর আমরা বিদায়প্রিয় একথা সম্পূর্ণ মিথ্যে। সাময়িক ভাবে বিদায়ের ভালো লাগলে যে চিরকালই ভালো লাগবে এমন কথা আমরা বলি না। রতোদা যে বিদায়প্রিয় নয়, সম্প্রতি রতোদার প্রাত্যহিক সান্ধ্যসেবকদলেই তার প্রমাণ। আর আমি কবি বলে বিদায়প্রিয় হবো, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনগণের কবি হতে চাই। জনতা হাসপাতালের [illegible] ঢাকবে কি করে? তাছাড়া, কবির চেয়ে বড় কথা আমি কবিতা লিখি, কবিতা লিখে দেশ ভাগ করার সব জন্য নিয়েছি। সুতরাং, সংসারে কিছুদিন বিদায় নিয়ে সংসার। সংকোচ কাটিয়ে ওঁকে এই [illegible] লাল চিঠি পাঠিয়ে দিলাম।

আমার কিছু [illegible] আছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে [illegible] আমি একটি পোড়াকপাল বলবো। কেননা, ঐ দিনিমণির [illegible] প্রাচুর্য কাশীতে এমনিতে যথেষ্ট, তাছাড়া, [illegible] ঐ ওঁর [illegible] থাকবে। আর আমার সঙ্গেও মিলবে ভালো।

এদিকে বেণুদার চেষ্টায় বাড়ি বদল হচ্ছে। এই পরিবর্তন খুব সময়োপযোগী হয়েছে, এইটুকু বলতে পারি। আমার কাছে [illegible] বস্তুর বাড়ি [illegible] কাছেই ভালো লাগবে।

সুমনদাদা, আমার দিদিমণির ভয়ে কাশীতে [illegible] পারি? [illegible] এইটুকু বেশ বুঝতে পারি।

[illegible] আমাকে [illegible] বলেই আছি, [illegible], কিন্তু একেবারে [illegible] যাবে আমাকে মারবার না, তাই আমার ওপর উদ্যত একটা বিষবৈরাগ্য ভাব পাচ্ছি। পরাশুনায় স্থির কয়েকদিন হলো উপায়ক ভাবি দিতে শুরু করেছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাবিকাল হিসাবে নাম ক্রয় করছি পরাজয় না করে না হোক, না করে যে [illegible] হবোই এইটাই আমার সবের বিষয় হয়েছে।

আশিস [illegible] সবাই ভালো তো? [illegible] সবাই, বিশেষ করে [illegible] ভগ্নি [illegible] আশ্রমের [illegible] পারীর [illegible] বেশ পারিচে। বিপদের [illegible] সুযোগ নিয়ে তাদের [illegible] করা হবে, একেবারে [illegible] না হওয়া পর্যন্ত সবাই [illegible], সকলের কাছে তাদের [illegible] খুলে ভবিষ্যতের [illegible] বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে

[illegible] সরকারকে [illegible] ও [illegible] দিতে তাঁর [illegible] পাঠিয়ে দিলাম, [illegible] হয়ে না বের। [illegible], [illegible], গোবিন্দ (মেজ)-[illegible] জন্য তো [illegible] তাদের [illegible] রেখেছি; তারা একরকম [illegible]।

[illegible] আমার [illegible] এই [illegible] শেষ [illegible]। সুতরাং [illegible] দীর্ঘ হইত।

[illegible]

স্নেহাশীর্বাদ

সুভাষ

বেশ শরিফ। বিপক্ষের বেহুদার সুযোগ নিয়ে তাদের লবেজান করা হবে, একেবারে জেরবার না হওয়া পর্যন্ত সবাই নাছোড়বান্দা, সকলের কাছে তাদের খিল্লাৎ খুলে ভবিষ্যতের খিল বন্ধ করে দেওয়া হবেই।

ফ্যা-পকাইকে[৫৭] আমার শুভেচ্ছা ও তদীয় জনক-জননীকে চিঠিতে ভ'রে প্রণাম পাঠিয়ে দিলাম। সাবধান হারায় না যেন। আর জুজুল, টুটুল, গোবিন্দ[৫৮] (মার[৫৯]) বাহিনীর জন্যে তো দোরগোড়ায় ভালবাসার কামান পেতে রেখেইছি; তারা একবার এলে হয়।

কাশীতে চালান করা এই আমার বোধহয় শেষ চিঠি। সুতরাং একটা দীর্ঘ ইতি।

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপনান্তে

স্নেহানুগত

সুকান্ত

□

পঁয়তাল্লিশ

সময়োচিত নিবেদন,

আগামী···তারিখে মদীয় পরীক্ষোৎসব সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে মহাশয়া ১১ডি রামধন মিত্র লেনস্থিত ভবনে আগমনপূর্বক উৎসব সম্পূর্ণ করিতে সহায়তা করিবেন।[৬০]

বিনীত

সু. ভ.

বিঃ দ্রঃ লৌকিকতার পরিবর্তে তিরস্কার প্রার্থনীয়।

ছেচল্লিশ

Jadabpur T. B. Hospital
L. M. H. Block Bed no-1
P. O. Jadabpur College
24 Parganas.

বন্ধুবরেষু,

সাতদিন কেটে গেল এখানে এসেছি। বড় একা একা ঠেকছে এখানে। সারাদিন চুপচাপ কাটাতে হয়। বিকেলের প্রতীক্ষায় থাকি, যদি কেউ আসে। সুভাষদা নিয়মিত আসছেন না, কেবল আমার জ্যাঠতুতো দাদাই নিয়মিত আসছেন। আপনি কবে আমার সঙ্গে দেখা করছেন? এখানে এলে "লেডী মেরী হার্বাট" ব্লকে আমার খোঁজ করবেন, আমার বেডের নম্বর 'এক'। শিয়ালদা দিয়ে ট্রেনে অথবা কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে ৮এ বাসে করে আসতে পারেন।[৬১]

৮।৪।৪৭

— সুকান্ত ভট্টাচার্য

□

সাতচল্লিশ

৮-২ ভবানী দত্ত লেন
১২. ৫. ৪৪

প্রিয় বন্ধু,

তোমাদের প্রথম চিঠি পাই নি; তারপর দুটো চিঠি পেয়েছি। অনেক চিঠি জমেছিল তাই উত্তর দিতে দেরি হল। রাগ ক'রো না। তোমাদের কাজের রিপোর্ট খুব প্রশংসা করবার মতো। এমনি কাজ করলেই একদিন তোমরা বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কিশোর বাহিনী হয়ে উঠবে। তোমরা মেম্বারের পয়সা মাথা পিছু এক আনা পাঠিয়ে দিলেই আমরা সভ্য কার্ড পাঠিয়ে দেব। তোমরা এই রকম নিয়মিত চিঠি দিও। তা হলে খুব আনন্দ পাব। তোমরা জানো না তোমাদের চিঠি পেলে আমাদের কত আনন্দ হয়। তবে উত্তর দিতে একটু দেরি হবেই। তোমাদের কিশোর বাহিনী সব নিয়ম মেনে চলে তো?[৬২]

কিশোর অভিনন্দন
সুকান্ত ভট্টাচার্য,
কর্মসচিব।

কেন্দ্রীয় অফিস
৮।২, ভবানী দত্ত লেন,
কলিকাতা
৭. ১০. ৪৪

প্রিয় বন্ধু,

তোমরা কী ধরনের কাজ করবে জানতে চেয়েছ তাই জানাচ্ছি, তোমরা প্রথমে নিজেদের লেখাপড়া ও আচার ব্যবহার—চরিত্রের উন্নতির দিকে নজর দেবে। নিজেদের স্বাস্থ্য ও খেলাধূলার দিকেও নজর দেবে সেই সঙ্গে। তোমরা গরীব ও অসুস্থ ছেলেদের সব সময় সাহায্য এবং সেবা করার চেষ্টা করবে, নিজের পাড়ার বা গ্রামের উন্নতির জন্য প্রাণপণ খাটবে। আর এই সমস্ত কাজ দেখিয়ে অভিভাবকদের মন জয় করার চেষ্টা করবে।

কার্ড এখনও অনেক আছে। যে ক'খানা দরকার জানিও আর কার্ড পিছু এক আনা পাঠিয়ে দিও।

সব সময় চিঠি পাঠাবে।[৬৩]

কিশোর অভিনন্দন নিও
কর্মসচিব।

□

উনপঞ্চাশ

৪।৭।৪৬

প্রিয় কমরেড,

আপনার অভিযোগ যথার্থ। কিন্তু মফস্বল জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লেখকরা কিশোর সভায় লেখা দিতে চান না ; কি করব বলুন ?

কিশোর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আপাতত আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। রসিদ বই ফুরিয়ে গেছে।[৬৪]

অভিনন্দনসহ
সুকান্ত ভট্টাচার্য

১। কবিবন্ধু অরুণাচল বসু।

২। এই সময় অরুণাচল বসুর সঙ্গে অর্থহীন অথচ বেশ ভারী ভারী শব্দ বানানোর খেলা চলছিল সুকান্তর। তখন কোনো কোনো লেখক অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দকে বাংলায় চালু করার চেষ্টা করছিলেন—তার প্রতি এটা ছিল দু'জনের কটাক্ষ।

৩। একটি মেয়ের ছদ্মনাম।

৪। অরুণাচলের মা শ্রীযুক্তা সরলা বসুর লেখা গল্প। পরে এটি "ছটি ফাগুন সন্ধ্যা" নামে প্রকাশিত হয়। এই চিঠিটার মাথায় সুকান্তর হাতে আঁকা কাস্তে-হাতুড়ি আছে।

৫। বেলেঘাটার বন্ধু শ্রীঅজিত বসু।

৬। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সুকান্তর মাসতুতো ভাই ও বন্ধু।

৭। শ্রীরমেন ভট্টাচার্য। ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের জেঠতুতো ভাই ও সুকান্তর বন্ধু।

৮। সহপাঠী বন্ধু শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার সরকার।

৯। সহপাঠী বন্ধু শ্রীশ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০। অগ্রজ শ্রীসুশীল ভট্টাচার্যের বন্ধু শ্রীবারীন্দ্রনাথ ঘোষ। এঁর সাহচর্যে সুকান্ত সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১১। 'শ্রীঅর্ণব' অরুণাচলের তৎকালীন ছদ্মনাম। গৃহত্যাগ করায় কৌতুক-চ্ছলে এই নামে সুকান্ত তাঁকে সম্বোধন করেছেন। এ চিঠির প্রেরণ তারিখ ১৯৪২ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ।

১২। সুকান্ত, অরুণাচল, ভূপেন এবং সুকান্তর সমবয়সী ছোটমামা বিমল ভট্টাচার্য—এই চারজনে 'চতুর্ভুজ' নামে একটি বারোয়ারী উপন্যাস লিখেছিলেন। চারজনে লিখতেন বলে ঐ উপন্যাস-পাঠের সাপ্তাহিক বৈঠকের নাম দেওয়া হয়েছিল 'চতুর্ভুজ'। এখানে সেই উপন্যাসেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩। জেঠতুতো দাদা শ্রীমনোজ ভট্টাচার্য।

১৪। অরুণাচলের বাবার পোস্ট-কার্ডের পিছনের অংশে লেখা এই চিঠিতে অরুণাচলের অসুস্থতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সুকান্ত।

১৫। পূর্বোল্লিখিত ছোটমামা শ্রীবিমল ভট্টাচার্য।

১৬। বৈমাত্রেয় বড়ভাই মনোমোহন ভট্টাচার্য ও তাঁর পত্নী সরযূ দেবী।

১৭। কবি শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই আলাপের বছর খানেক আগে, সুকান্তর জেঠতুতো দাদা ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলেজের বন্ধু মনোজ ভট্টাচার্যের সহায়তায়, অবশ্য সুকান্তর একবার প্রাথমিক সাক্ষাৎ ও সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়।

১৮। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।

১৯। গ্রামে থাকার সময় সেখানকার উৎসাহীদের নিয়ে অরুণাচল 'ত্রিদিব' নামে পত্রিকা বার করেন। এখানে ঐ পত্রিকার উল্লেখ করা হয়েছে।

২০। সে সময় রাজনীতিতে অনুৎসাহী অরুণাচল উক্ত পত্রিকার জন্য একটি দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক কবিতা চেয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে সুকান্ত 'মুহূর্ত' কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন।

২১। ঐ গ্রামীণ পাঠাগারের জন্য অরুণাচলের অনুরোধে সুকান্ত এই বইয়ের তালিকা পাঠান। ঐ তালিকার তলায় লেখা আছে "এই চিঠির প্রেরণ তারিখ ২৬শে ফাল্গুন, ৪৯"।

২২। এই চিঠিও সুকান্ত লিখেছিলেন অরুণাচলের বাবার লেখা পোস্টকার্ডের পিছনে। অরুণাচলের বাবার ঐ চিঠির তারিখ ইং ৪।৪।৪৩।

২৩। কবি শ্রীঅরুণ মিত্র এবং কবি ও সাংবাদিক সরোজকুমার দত্ত।

২৪। পূর্বোল্লিখিত ছোটমামা বিমল।

২৫। সম্বোধনহীন এই চিঠিটিও অরুণাচলকে লেখা।

২৬। এই চিঠিটি ১৯৪৩ সালের জুন মাসে লেখা।

২৭। সুকান্তর অগ্রজ শ্রীসুশীল ভট্টাচার্যের বিয়ের দিন।

২৮। সুকান্তর জেঠতুতো মেজদা রাখাল ভট্টাচার্যের স্ত্রী রেণু দেবী।

২৯। শ্রীরমাকৃষ্ণ মৈত্র—তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী ও পরে 'ইণ্ডিয়ান স্টাডিস পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট'-এর ব্যবস্থাপক সম্পাদক।

৩০। লক্ষ্মীবাবু চিত্রশিল্পী। ইনি কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক কর্মী ছিলেন।

৩১। চিঠিতে সুকান্ত স্বাক্ষর ও তারিখ দিতে ভুলে গেছেন। পোস্টঅফিসের শিলমোহরে তারিখ আছে ইং ১৩।৬।৪৪।

৩২। সুকান্তর অনুজ শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য।

৩৩। অরুণাচলের অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে লিখে যাওয়া এই চিঠিটির তারিখ ইং ২৯।৭।৪৪।

৩৪। তৎকালীন ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য।

৩৫। পার্টিকর্মী শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ।

৩৬। পরীক্ষার ঠিক আগে অরুণাচলের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ায় বাড়ি ফিরে লাঞ্ছনার ভয় করেছিলেন সুকান্ত। সহপাঠিনী হলেন সেই মেয়েটি যাঁকে সুকান্ত ভালবাসতেন। পোস্ট-অফিসের শিলমোহরে এ-চিঠির তারিখ চিহ্নিত আছে ইং ২৮।২।৪৫।

৩৭। বর্তমান ত্রিপুরার সাম্যবাদী নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী।

৩৮। অরুণাচল স্বাধীনতা-র কিশোর সভা-য় নামের আদ্যক্ষর (অ) স্বাক্ষর করে কার্টুন আঁকতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে বিব্রত করবার জন্যেই সেই সই-সহ কিশোর সভা-র পাতায় একটি ছবি ছাপেন সুকান্ত। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে চিঠি লিখলে, অরুণাচলকে সুকান্ত এই উত্তর দেন। অহিনকুল মুখোপাধ্যায় বলতে শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে বুঝতে হবে। কেননা ছবিটি তিনিই এঁকে দিয়েছিলেন।

৩৯। ডায়ালেক্‌টিকাল আদালত বলে সুকান্ত যাঁকে ভালবাসতেন তাঁর কাছে নালিশের ভয় দেখিয়েছিলেন অরুণাচল। কারণ সুকান্তর সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক ছিল 'দ্বন্দ্ব-মধুর'।

৪০। তখন অরুণাচল ও সুকান্তর ভাব আদান-প্রদানে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ শব্দের অন্যতম এই 'মেটাফিসিকস্' শব্দটি। বেলেঘাটার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই বিভূতি বসু অরুণাচল-সুকান্তর সঙ্গে দেখা হলেই তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনায় এই কথাটি খুব ব্যবহার করতেন। অতীত জীবনে বিপ্লবী অকৃতদার ও বেশ কিছুটা আত্মভোলা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এই মাস্টারমশাই।

৪১। বর্তমান চিঠিটি ও 'প্রিয় বয়স্য' সম্বোধনযুক্ত চিঠিখানি একই পোস্ট-কার্ডের উভয় পিঠে লেখা।

৪২। সুকান্ত তখন সাময়িক অসুস্থ হয়ে পার্টির হাসপাতাল 'রেড-এড কিওর হোমে'। একই শহরে থেকেও অরুণাচল দীর্ঘদিন তাঁকে দেখতে যেতে পারেন নি। তাই সম্বোধনটির মাধ্যমে তাঁর বন্ধুবাৎসল্যকে খোঁচা দিয়ে এই ফাঁকা (ড্যাস্ চিহ্নিত) কার্ডের চিঠিটি লেখেন সুকান্ত।

৪৩। এই চিঠিটি অন্যের হাতে পাঠানো একটি হাত-চিঠি। তারিখ সম্ভবত ৩রা বা ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪৬।

৪৪। বর্তমান চিঠিটিও ঐ একই সময়কার একটি হাত-চিঠি।

৪৫। অধ্যাপক শিশির চট্টোপাধ্যায়। এ-চিঠিটি সম্ভবত সুকান্ত অসুস্থ শরীরে অরুণাচলের অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে লিখে রেখে যান।

৪৬। শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

৪৭। জেঠতুতো দাদা রাখাল ভট্টাচার্য।

৪৮। পূর্বোল্লিখিত রেণু দেবী ও সুকান্তর বড় মাসি।

৪৯। অরুণাচলকে লেখা সুকান্তর সর্বশেষ চিঠি।

৫০। অরুণাচলের মা লেখিকা শ্রীমতী সরলা বসুকে লেখা চিঠি। সম্ভবত ১৩৪৮ সালের 'চৈত্র সংক্রান্তি' তারিখে অরুণাচলকে লিখিত চিঠিটির সঙ্গে এটি প্রেরিত হয়। ভাঁজ করা এই চিঠিটির পিছনে লেখা আছে "শ্রীমতী সরলা দেবী সমীপেষু"।

৫১। ১৯৪২ সালের ৪ঠা মে তারিখে অরুণাচলের বাবা অশ্বিনীকুমার বসুর পোস্ট-কার্ডের চিঠির পিছনে এই চিঠি লেখেন সুকান্ত।

৫২। ১৯৪২ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে অরুণাচলকে লেখা "সৎসঙ্গ শরণম্, শ্রীশ্রীশ্রী ১০৮ অর্ণবস্বামী গুরুজী মহারাজ সমীপেষু" সম্বোধন-যুক্ত চিঠিটির সঙ্গেই এটি প্রেরিত হয়।

৫৩। এ চিঠিটি সম্ভবত ১৯৪৭ সালের ৭ই মার্চ লেখা।

৫৪। অরুণাচলের বাবা অশ্বিনীকুমার বসুকে লেখা চিঠি। সম্ভবত ইংরেজি তারিখ ২০শে মে ১৯৪২।

৫৫। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পরবর্তী চারটি চিঠিও এঁকে লেখা।

৫৬। ছোটমামা শ্রীরিমল ভট্টাচার্য।

৫৭। পূর্বোল্লিখিত শ্রীরমেন ভট্টাচার্যের দিদি শ্রীমতী বিমলা দেবীর দুই কন্যা। সুকান্ত কাশীতে এঁদের বাড়িতে ছিলেন।

৫৮। ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী মালবিকা ও পত্রলেখা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীউদয়ন ভট্টাচার্য।

৫৯। জেঠাইমা।

৬০। কাশীতে মেজবৌদি রেণু দেবীকে লেখা চিঠিতে সুকান্ত যে লাল কার্ডের উল্লেখ করেছেন তা হল এই চিঠি। এটিও তাঁকেই লেখা।

৬১। গল্প-লেখক শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি। ১৯৭২ সালের আগস্টে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

৬২। কিশোর বাহিনীর কর্মসচিব হিসাবে কিশোর বাহিনীর কোনো সদস্যকে লেখা চিঠি।

৬৩। পরিচিতি ৬২ দ্রষ্টব্য।

৬৪। হুগলীর বিশিষ্ট কমিউনিস্ট কর্মী শ্রীমদন সাহাকে লেখা চিঠি।

□